POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ
فَحَاقَ بِالَّذِيْنَ سَخِرُوْا مِنْهُمْ مَّا
كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

এবং তোমার পূর্বেও রসূলগণকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা হইয়াছে, ফলে তাহাদের মধ্য হইতে যাহারা হাসি-বিদ্রূপ করিয়াছিল তাহাদিগকে উহাই পরিবেষ্টন করিয়াছিল যাহা লইয়া তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করিত।

(আল আনআম: ১১)

بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 7

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 4

সম্পাদক: তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক: মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার 27 জানুয়ারী, 2022 23 জামাদিউস সানি 1443 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

কাদিয়ানের পূণ্যভূমিতে অনুষ্ঠিত হল ১২৬তম বাৎসরিক জলসা

কোভিড মহামারি পরিস্থিতি অন্তরের মলিনতা দূর করে নি, আল্লাহ্ তা'লার এই সতর্কবার্তা থেকে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করছে না। এই আচরণ চলতে থাকলে বড় ভয়াবহ পরিণাম সৃষ্টি হবে।

(আজ আমি ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার কয়েকটি দিক তুলে ধরব। এই শিক্ষা বাস্তবায়িত হলে পৃথিবী শান্তি ও নিরাপত্তার আবাস হতে পারে।

ইসলাম শিক্ষা দেয়, একে অপরের ধর্মগুরুদের দোষারোপ করো না।

ইসলাম একথা বলে না যে, অন্যান্য সকল ধর্ম মিথ্যা। ইসলামের দাবি হল, প্রত্যেক জাতিতে নবীর আগমণ ঘটেছে। কুরআন করীমের আয়াত وَاِنْ مِّنْ اُمَّةٍ اِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ ○ এর আলোকে মুসলমানরা হযরত ঈসা (আ.) কে বা হিন্দুদের অবতারদেরকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখে।

ইসলাম শিক্ষা দেয়, প্রত্যেক ধর্মের অনুসারী ও তাদের প্রবর্তকদের সম্মান কর।

ইসলাম সম্পর্কে এই ভ্রান্ত ধারণা তৈরী করা হয়েছে যে ইসলাম উগ্রপন্থার ধর্ম এবং প্রারম্ভিক যুগে জোর করে মুসলমান বানানো হয়েছে। অথচ ইসলাম একথা অস্বীকার করে।

ইসলাম ইহজগতে অমান্যকারীদের জন্য কোন শাস্তি নির্ধারণ করে নি। আজও যদি মুসলমানদের কর্মধারা এই শিক্ষাসম্মত হয়ে যায়, তবে ইসলামের প্রতি সমগ্র জগতের মনোযোগ নিবদ্ধ হবে।

সংশোধনকে দৃষ্টিপটে রাখতে হবে। দেখতে হবে যে শাস্তি দিলে সংশোধন হবে না ক্ষমা করলে। সংশোধনই যেন প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়।

ইসলামের শিক্ষা দেয়, যাবতীয় লেন-দেনের সময় অপরের অধিকার রক্ষার বিষয়ে যত্নবান থাকা উচিত।

কোভিড পরিস্থিতির কারণে হুযুর আনোয়ার-এরর নির্দেশক্রমে এবং সরকারি নির্দেশিকা অনুসারে সীমিত পরিসরে জলসার আয়োজন। *লাইভ স্ট্রীমিং-এর মাধ্যমে ব্যপকহারে জলসা থেকে মানুষ উপকৃত হয়েছে। * লাইভ স্ট্রীমিং -এর মাধ্যমে এক লক্ষ ছয় হাজার ৬৪৬ জন মানুষ জলসা শুনেছে। জলসায় ৮ টি দেশের মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন।

আল হামদোলিল্লাহ, গত ২৪, ২৫ ও ২৬ শে ডিসেম্বর, ২০২১ তারিখে জলসা সালানা কাদিয়ান বুস্তানে আহমদের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সুসম্পন্ন হল। কোভিডের বর্তমান পরিস্থিতির কথা সামনে রেখে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর দিক-নির্দেশনাক্রমে কাদিয়ানে সশরীরে জলসায় যোগদানকারীর সংখ্যা সীমিত ছিল। কিন্তু লাইভ স্ট্রিমিং-এর মাধ্যমে সমগ্র ভারতের আহমদীরা জলসা শুনেছে। প্রতিবারের ন্যায় এবারও কাদিয়ানবাসীরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের অভ্যর্থনা জানাতে তাদের ঘর বাড়ি ও ওলিগলি পরিস্কার করেছে এবং প্রত্যেকে নিজের নিজের মত করে জলসার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে। গণ-সাফাই অভিযানের মাধ্যমে পুরো কাদিয়ানকে পরিস্কার করা হয়। জলসার কিছু দিন আগেই জলসার উদ্দেশ্যে জামাতের নিজস্ব বিদ্যুত বিতরণ বিভাগের পক্ষ থেকে মহল্লার সমস্ত গলিতে ও মূল সড়কে টিউব লাইট দ্বারা আলোকিত করা হয়। বেহেশতি মাকবারা, দারুল মসীহ, মসজিদ মুবারক, মসজিদ আকসা, মিনারাতুল মসহীকে ছোট ছোট রঙীন বাল্ব দিয়ে সাজানো হয়। এইভাবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই আধ্যাত্মিক জনপদটি নিজের অভ্যন্তরীণ আভার পাশাপাশি বাহ্যিক আভার বিচ্ছুরণে ঝলমল করছিল।

কর্মী ও জলসার ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষণ

২১ শে ডিসেম্বর, মঙ্গলবার প্রায় পৌনে এগারোটার সময় বুস্তানে আহমদে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রতিনিধি মৌলনা মহম্মদ ইনাম গৌরী সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানটির পরিচালনা হয়। আহলাঁও ও সাহলাঁও ওয়া মারহাবা ধ্বনিতে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়। সর্বপ্রথম তিনি জলসা সালানার বিভিন্ন বিভাগের ব্যবস্থাপক ও সহ-ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে সঙ্গে সাক্ষাত করেন। এরপর কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। এরপর হুযুর আনোয়ারের প্রতিনিধি মহাশয় বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, দুই বছর পর কাদিয়ানের জলসা সালানা আয়োজনের সৌভাগ্য হচ্ছে। আলহামদোলিল্লাহ। যদিও এই জলসায় সশরীরে উপস্থিত অতিথিদের সংখ্যা সীমিত থাকবে, কিন্তু লাইভ স্ট্রীমিং-এর মাধ্যমে গোটা দেশে জলসা শোনা এবং দেখা হবে। তিনি অডিও-ভিডিও বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন, লাইভ স্ট্রীমিংয়ের মাধ্যমে জলসা দেখানো যেহেতু এক বিরাট দায়িত্বের কাজ,

এরপর ৮ পাতায়.....

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

বি:দ্রঃ- সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। সৎকর্ম করলে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি রয়েছে আর মন্দকর্ম করলে জাহান্নামে যেতে হবে। এতে খোদা তা'লার লাভ কি? হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২০ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর চিঠিতে লেখেন-

নীতিগতভাবেই এই প্রশ্নটি সঠিক নয়। কেননা, ম্যানুষকে জান্নাতের প্রলোভন দেখিয়ে সৎকর্ম করতে উৎসাহিত করা কিম্বা জাহান্নামের ভয় দেখিয়ে মন্দকর্ম থেকে নিবৃত্ত করা মোটেই ইসলামের শিক্ষা নয়। কোনও প্রকারের প্রলোভন বা ভীতি প্রসূত ঈমান দুর্বল হয়ে থাকে। স্রষ্টার সহিত সৃষ্টির এমন দৃঢ় সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয় যা বেহেশতের লালসা কিম্বা দোযখের ভয় থেকে মুক্ত হবে। যুক্তির খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, বেহেশত কিম্বা দোযখ কিছুই নেই, তবু প্রভু-প্রতিপালকের উপাসনায়, তাঁর প্রতি ভালবাসা ও আনুগত্যে কোনও ত্রুটি থাকা উচিত নয়। এই কারণেই কুরআন করীম ও হাদীসে স্রষ্টা ও সৃষ্টির সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানুষ যেন আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলী ধারণ করে তাঁর প্রকৃত বান্দা হবে আর তার প্রতিটি কথা ও কাজে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ দৃষ্টিপটে থাকে।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই বিষয়টিকে একাধিক স্থানে বর্ণনা করেছেন। একস্থানে তিনি বলেন, 'আমাদের খোদা-ই আমাদের বেহেশত, আমাদের খোদাতেই আমাদের পরম আনন্দ নিহিত রয়েছে। কেননা আমরা তাঁকে দেখেছি এবং সকল সৌন্দর্য তাঁর মধ্যে পেয়েছিল। এই সম্পদ নেওয়ার যোগ্য, প্রাণের বিনিময়ে হলেও। এই পান্না ক্রয়যোগ্য, নিজের যাবতীয় সত্তা বিলীন করে হলেও।'

(কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃ: ২১)

কাজেই আল্লাহ্ ও বান্দার মাঝের সম্পর্ক প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের সম্পর্কে ন্যায় হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোন প্রেমিক তার প্রেমাস্পদকে একথা বলে না যে, তুমি আমাকে এত টাকা বা অমুক অমুক বস্তু দিলে তবে আমি তোমাকে ভালবাসব। কখনওই নয়। প্রেমিক যাবতীয় লোভ-লালসা থেকে মুক্ত থাকে।

আর এতে আল্লাহ্ তা'লার লাভ কি? এর উত্তরে বলতে হয় যে, এতে আল্লাহ্র কোন লাভ নেই, তিনি সকল লাভ ও ক্ষতির উর্দ্ধে। তিনি মানুষকে নিজের উপকারের জন্যই এই শিক্ষা দিয়েছেন। এই জন্যই তিনি বলেন, যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, তার নিজেরই উপকার হয়। আর যে অকৃতজ্ঞ থাকে, এমন ব্যক্তির বিষয়ে আল্লাহ্ মোটেও পরওয়া করেন না। আল্লাহ্র অতীব প্রশংসার অধিকারী।

(সূরা লুকমান: ১৩)

প্রশ্নটির দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায় যে প্রশ্ন করে যে, শিশুকে মায়ের দুধ খাইয়ে বা সে অসুস্থ হলে তিক্ত ওষুধ সেবন করিয়ে মায়ের কি লাভ হয়? বা একজন শিক্ষক ছাত্রকে পাশ করালে বা তাকে ফেল করালে শিক্ষকের লাভ কি?

যেভাবে এই কাজগুলিতে মায়ের বা শিক্ষকের কোন লাভ বা ক্ষতি নেই, বরং শিশু ও ছাত্রটির লাভ বা ক্ষতি আছে, অনুরূপভাবে আল্লাহ্ ও বান্দার সম্পর্কেও আল্লাহ্র কোন লাভ বা ক্ষতি নেই, বরং ঐশী বিধিনিষেধ পালন করলে মানুষের লাভ আর অমান্য করলে ক্ষতি রয়েছে।

প্রশ্ন: আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পবিত্র গ্রন্থসমূহে জটিল ভাষা কেন বর্ণনা করেছেন? সব কিছু সরল ভাষায় ও সরল ভঙ্গিতে কেন বর্ণনা করেন নি? অথচ তিনি জানতেন যে পরবর্তীকালে এ নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হবে।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০২০ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখের চিঠিতে লেখেন- 'আসল কথা হল উৎকৃষ্ট মানের ঈমানের জন্য পরীক্ষার শর্ত থাকে। এই কারণেই সূরা বাকারার প্রারম্ভিক আয়াতসমূহে হেদায়াতলাভকারী এবং সফলকাম মুত্তাকীদের এই বৈশিষ্ট্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা অদৃশ্যের উপর ঈমান আনে। অতএব, সর্বদা এই শর্তেই উপযোগী হয় যখন এর মধ্যে একটি বিষয় সুপ্ত থাকে, যাতে ঈমান আনয়নকারী ও অস্বীকারকারীদের মাঝে স্পষ্ট পার্থক্য বোঝা যায়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই সুপ্ত থাকার অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা বর্ণনা করে বলেন- "ভবিষ্যদ্বাণীতে কিছুটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত বা সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়ের বর্ণনা থাকাও আবশ্যক। এটিই খোদা তা'লার চিরাচরিত রীতি। .... তওরাত ও ইঞ্জিলে আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলি রয়েছে, সেগুলি যদি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় হত..... তবে ইহুদীরা তাঁকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করতে পারত না। কিন্তু খোদা তা'লা স্বীয় বান্দাদের পরীক্ষা নেন। তিনি দেখেন যে তাদের মধ্যে মুত্তাকি যারা নিদর্শন দেখে সত্যকে চিনতে পারে এবং তার উপর ঈমান আনে।"

(মালফুযাত, ৯ম খণ্ড, পৃ: ২৮৩)

প্রশ্ন: ২০২০ সালের ১৪ই নভেম্বর লাজনা ইমাউল্লাহ্ বাংলাদেশের ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সময় হুযুরকে এক লাজনা সদস্য প্রশ্ন করেন যে, কচি শিশুদের মায়েদেরকে নামাযের সময় সঙ্গে নিয়ে যেতে হয় বা কোলে করে নামায পড়তে হয়। স্বাভাবিকভাবেই সেই সময় নামাযের চেয়ে শিশুদের প্রতি মনোযোগ বেশি যায়। সেই কারণে আমরা নামাযের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হই না তো? হুযুর আনোয়ার বলেন:

না, বঞ্চিত হও না। কিন্তু শিশু যখন কাঁদে তখন তাকে কোলে তুলে নিয়ে নামায পড়লেন। যখন সিজদায় গেলেন তখন বাচ্চাকে পাশে বসিয়ে রেখে নামায পড়লেন। এভাবে নামায পড়বেন। এটা তো একান্ত অপারগতার পরিস্থিতি আর আল্লাহ্ তা'লা অন্তর্যামী। আপনি যেহেতু সদিচ্ছা নিয়ে নামায পড়ছেন, তাই আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে প্রতিদান দিবেন। কিন্তু নামাযের জন্য আপনি যথেষ্ট সময় পান। ফজরের সময় শিশুরা সাধারণত ঘুমিয়ে থাকে। অন্যথা ফিডার বা দুধ দিয়ে তাদের ঘুম পাড়িয়ে খুব সহজে আপনি ফজরের নামায পড়তে পারেন। চেষ্টা করবেন বাচ্চাকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়ার বা দুধ খাইয়ে শুইয়ে দেওয়ার।এরপর যদি সময় থাকে আপনি খুব নির্বিঘ্নে নামায পড়তে পারেন। আর যদি সময় কম থাকে, সূর্য প্রায় অস্তমিত বা ফজরের নামাযের সময় সূর্যোদয়ের সময় হচ্ছে, তখন বাধ্য হয়ে দ্রুত নামায পড়তে হয়। কিম্বা সূর্যাস্তের কারণে আসরের নামায নষ্ট হওয়া আশঙ্কা থাকে, তবে দ্রুত নামায পড়ে নিন। কিন্তু সাধারণত চেষ্টা করবেন বাচ্চার কাজ সেরে, তাকে ঘুম দিয়ে বা শুইয়ে দিয়ে নামায পড়ার। কিন্তু যদি তা না হয়, বাচ্চাকে কোলে নিয়েও নামায পড়তে হয়, তবে তাতেও অসুবিধের কিছু নেই। কিন্তু আপনি চেষ্টা করবেন যতটা সম্ভব নামাযের দিকে মনোযোগ দেওয়ার এবং নামাযের শব্দাবলী নিয়ে অভিনিবেশ করার। আল্লাহ্ তা'লা প্রতিদান দিবেন, তিনি রহমান ও রহীম। তিনি ক্ষমাশীল। তিনি এমন অত্যাচার কারোর উপর করেন না। তিনি সকল পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক অবগত। কিন্তু যদি যাবতীয় চেষ্টা সত্ত্বেও কোন মেয়ের সময় না থাকে, বাচ্চাকে কোলে নিয়েই নামায পড়তে বাধ্য হতে হয়, তবে আল্লাহ্ তা'লা তাকে এর প্রতিদান থেকে বঞ্চিত রাখেন না।

প্রশ্ন: এই সাক্ষাত অনুষ্ঠানেই এক লাজনা সদস্যা প্রশ্ন করেন যে, অনেক সময় বিয়ের পর মেয়েরা নিজেদের নাম পরিবর্তন করে স্বামীর নাম যুক্ত করে নিজের নাম রাখে। ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে এমনটি করা কি বৈধ?

হুযুর আনোয়ার বলেন: এতে কোন অসুবিধে নেই। কেউ নাম রাখলে তাতে অসুবিধের কি আছে? সরকারি নথিতে তার যে পরিচয় রয়েছে, সেটি নিয়ে সমস্যা হয়। অনেক সময় সরকারি নথিতে এক রকম নাম রয়েছে, যেমন- আতিয়া বাবর কিম্বা কেউ নিজের পিতার নাম যুক্ত করে নাম রেখেছে। যখন তার বিয়ে হবে, সরকারি নথিতে নাম নভিভুক্ত হবে, তার নিকাহ ফর্ম বা সরকারি নথিতে তার নাম যদি আতিয়া মুবাশ্বির হয়ে যায়- বাবর-এর পরিবর্তে মুবাশ্বির হয়ে যায়, তবে তাতে অসুবিধে কি? এতে কোন অসুবিধে নেই। স্বামীর নাম যুক্ত করে নাম রাখার অনুমতি ইসলাম অবশ্যই দিয়েছে। তার আসল নাম হল আতিয়া। দ্বিতীয় নামটি তার পরিচয়ের জন্য রাখা হয়েছে। পূর্বে পিতা ছিল তার পরিচয়। এখন বিয়ের পর তার পরিচয় হবে স্বামী। বরং স্বামীর পরিচয়ের সঙ্গে নাম রাখা ভাল, এতে স্বামী তার স্ত্রীর সম্মানের বিষয়ে যত্নবান থাকবে এবং উভয়ের মধ্যে ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে। তাই নিজের নামের সঙ্গে স্বামীর নাম যুক্ত করতে অসুবিধের কিছু নেই।

প্রশ্ন: এই সাক্ষাতানুষ্ঠানেই এক লাজনা সদস্যা প্রশ্ন করেন যে, এই মহামারিকালে আমরা পূর্বের ন্যায় তবলীগ করতে পারছি না। এমতাবস্থায় আমরা কিভাবে নিজেদের কাজ অব্যাহত রাখব? এবিষয়ে আমরা হুযুরের দিক-নির্দেশনা চাই।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা বাইরে যেতে পারব না, ঘরে থাকতে বাধ্য। কিছু কিছু দেশে কোভিডের কারণে সামাজিক দূরত্ব এবং অন্যান্য বিধিনিষেধ রয়েছে। কিন্তু এতে অনলাইনে ব্যক্তিগতভাবে মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে। যারা কাজ করে, তারা অনলাইন তবলীগের জন্য নিজেদের কর্মসূচি তৈরী করে ফেলেছে। যদি আপনাদের তবলীগ বিভাগ সোশাল মিডিয়ায় বা অন্য কোন ওয়েব সাইট তৈরী করে থাকে,তবে সেখানে লাজনারা তবলীগ করতে পারে, সমস্ত লাজনারা তাতে অংশগ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া নিজেদের পরিচিতদের ফোন করে বা সোশাল মিডিয়ার মাধ্যমে বার্তা পাঠিয়ে কোন ভাল বার্তা বা উদ্ধৃতি পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে ক্রমে রাস্তা তৈরী হয়। তাই এমন পরিস্থিতিতে তবলীগ করার জন্য নিত্য নতুন পন্থা খোঁজা যেতে পারে। এগুলি নিজেদেরকেই খুঁজে বের করতে হবে। বুঝতে পেরেছেন?

প্রশ্ন: এক লাজনা সদস্যা প্রশ্ন করেন যে, বিয়ের ক্ষেত্রে ধর্মকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বর্তমান যুগের মানুষ সৌন্দর্য এবং অন্যান্য গুণাবলীকে প্রাধান্য দিচ্ছে, যার কারণে জামাতের বহু পুণ্যবতী ও

এরপর ১০ পাতায়.....

জুমআর খুতবা

কুরাইশরা যখন মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দেওয়ার বিষয়ে একমত হয় এবং তারা একটি চুক্তিপত্র লিখে, তখন হযরত সিদ্দীক (রা.) সেই কষ্টের যুগেও মহানবী (সা.)-এর সঙ্গী ছিলেন।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান।

দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন জগদ্বাসীকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে চেনার তৌফিক দান করেন এবং সকল অনিষ্টের মূল উৎপাটন করেন আর বিশ্ববাসী যেন তাদের সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে সক্ষম হয়।

জানাযা গায়েব: মাননীয় আল হাজ আব্দুর রহমান এনিন সাহেব (জলসা সালানা ঘানার অফিসার) , মাননীয় আযইযাব আলি মহম্মদ আল জাবালী (জর্ডন) , মাননীয় দ্বীন মহম্মদ শাহিদ সাহেব (প্রাক্তন মুরুব্বী) , মাননীয় মিঞা রফিক আহমদ সাহেব (রাবোয়া) এবং মাননীয়া কানিতা যাফর সাহেবা (যুক্তরাষ্ট্রের জামাতের সাবেক আমীর আহসানুল্লাহ্ যাফর সাহেবের স্ত্রী)

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ১৭ শে ডিসেম্বর, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (১৭ ফাতাহ, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত আবু বকর (রা.)'র স্মৃতিচারণে তাঁর ক্রীতদাস মুক্ত করা সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। এ সম্পর্কে আরও কিছু ঘটনা রয়েছে। হযরত আবু বকর (রা.) নাহদীয়া এবং তার মেয়ে উভয়কে মুক্ত করিয়েছেন। তারা উভয়ে বনূ আব্দুদ্ দ্বার (গোত্রের) এক মহিলার দাসী ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) তাদের উভয়ের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাদের মালিকতাদেরকে আটা ভাঙ্গানোর জন্য পাঠিয়েছিল আর সে বলছিল, আল্লাহ্‌র কসম বা অন্য কারো নামে কসম খাচ্ছিল যে, আমি তোমাদের কখনও মুক্ত করবো না। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে অমুকের মা! নিজের শপথ ভেঙ্গে ফেল। সে বলে, যাও, যাও। তুমিই তো এদের নষ্ট করেছ। তোমার যদি এতই দরদ থাকে তাহলে তুমি এদের উভয়কে মুক্ত করিয়ে নাও। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, এদের উভয়ের বিনিময়-মূল্য কত দিতে হবে? সে বলে, এই পরিমাণ এবং এই পরিমাণ (অর্থ)। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি তাদের উভয়কে (কিনে) নিলাম এবং (এখন) এরা দু'জন স্বাধীন। এরপর তিনি (রা.) তাদেরকে বলেন, ঐ মহিলার আটা ফিরিয়ে দাও, অর্থাৎ যাদের দাসী বানানো হয়েছিল তাদেরকে বলেন, এই মহিলার আটা ফিরিয়ে দাও, যা (তারা) ভাঙ্গানোর জন্য নিয়ে যাচ্ছিল। তারা উভয়ে বলেন, হে আবু বকর (রা.)! আমরা এই কাজ সমাধা করে তারপর আটা ফিরিয়ে দিয়ে আসি? অর্থাৎ, আমাদের ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, তা শেষ করে নেই এবং আটা ভাঙ্গিয়ে দিয়ে আসি? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, ঠিক আছে। যদি তোমরা চাও তাহলে এরূপই করো।

হযরত আবু বকর (রা.) একদা বনূ মু'আম্মল (গোত্রের) এক দাসীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। বনূ মু'আম্মল ছিল বনূ আদী বিন কা'ব এর একটি গোত্র। সেই দাসী মুসলমান ছিলেন। উমর বিন খাত্তাব (রা.) তাকে কষ্ট দিচ্ছিলেন, যাতে তিনি ইসলাম পরিত্যাগ করেন। হযরত উমর (রা.) তখনও মুশরিক ছিলেন, ইসলাম গ্রহণ করেন নি। তিনি (সেই দাসীকে) মারধোর করতেন (আর মারতে মারতে) ক্লান্ত হয়ে গেলে তিনি বলতেন, আমি শুধুমাত্র ক্লান্ত হয়ে পড়ার কারণে তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি। তখন সেই (দাসী) বলতেন, তোমার সাথেও আল্লাহ্ এমনটিই করবেন। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) তাকেও ক্রয় করে মুক্ত করে দেন।

একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে, হযরত আবু বকর (রা.)'র পিতা আবু কোহাফা তাঁকে বলেন, হে আমার পুত্র! আমি দেখছি যে, তুমি দুর্বল লোকদের মুক্ত করাচ্ছ। তুমি যদি এটিই করতে চাও তাহলে শক্তিশালী পুরুষদের মুক্ত করাও, যাতে তারা তোমার নিরাপত্তা বিধান করতে পারে এবং তা রা তোমার সাহায্যে দণ্ডায়মান হয়। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে আমার প্রিয় পিতা! আমি তো শুধুমাত্র মহাপ্রতাপান্বিত ও সম্মানিত আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি কামনা করি।

(আসসীরাতুন নাবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ২৩৬)

অতএব, কোন কোন তফসীরকারক (যেমন) আল্লামা কুরতুরী এবং আল্লামা আলুসী প্রমুখ বলেন, হযরত আবু বকর (রা.)'র এরূপ কর্মকাণ্ডের ফলেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সম্পর্কে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো অবতীর্ণ করেন।

فَأَمَّا مَنْ أَعْطٰى وَاتَّقٰى ○ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ○ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرٰى ○ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ○ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ○ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرٰى ○ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدّٰى ○ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ○ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولٰى ○ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ○ لَا يَصْلٰهَا إِلَّا الْأَشْقَى ○ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ○ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ○ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكّٰى ○ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزٰى ○ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلٰى ○ وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ○

(সূরা আল্ লায়ল: ৬-২২)

অতএব, যে (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) দান করেছে ও তাকওয়া অবলম্বন করেছে এবং সর্বোত্তম পুণ্যের সত্যায়ন করেছে আমরা অবশ্যই তাকে স্বাচ্ছন্দ্য দান করব। কিন্তু যে কৃপণতা করেছে ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করেছে এবং যে উত্তম বিষয়কে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে সেক্ষেত্রে আমরা অচিরেই তাকে দুঃখ-দুর্দশায় জর্জরিত করে দিব। আর সে যখন ধ্বংস হবে তখন তার ধনসম্পদ তার কোন উপকারে আসবে না। নিশ্চয় হিদায়াত দেয়া আমাদের জন্য আবশ্যক এবং নিশ্চয় পরকাল ও ইহকাল আমাদেরই আয়ত্তাধীন। অতএব, আমি তোমাদেরকে এক জ্বলন্ত অগ্নি সম্বন্ধে সতর্ক করে দিলাম। চরম হতভাগা ছাড়া কেউই তাতে প্রবেশ করবে না (অর্থাৎ) যে (স্পষ্ট সত্যকে) মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছে। তবে পরম মুত্তাকীকে অবশ্যই তা হতে দূরে রাখা হবে যে আত্মশুদ্ধি লাভের জন্য নিজ সম্পদ ব্যয় করে। আর তার প্রতি কারো এমন কোন অনুগ্রহ নেই যার বিনিময় তাকে দিতে হয়। বরং তার সর্বমহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভই তার একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আর তিনি অবশ্যই (তার প্রতি) সন্তুষ্ট হবেন।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসীয়াত অউর কারনামে, উর্দু অনুবাদ, পৃ: ৭৪) (আল জামিউল আহকামুল কুরআন লি ইমামিল কুরতাবি,২য়খণ্ড, পৃ: ৩৩৩০, সূরাতুল লাইল)

হযরত আবু বকর (রা.) যেসব ক্রীতদাসকে মুক্ত করেছিলেন হযরত খাব্বাব বিন আরত (রা.)ও তাদের একজন ছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হযরত খাব্বাব বিন আরত (রা.)'র উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "অপর এক সাহাবী যিনি প্রথমে ক্রীতদাস ছিলেন, তিনি একবার গোসল করার জন্য জামা খুলেন তখন পাশেই আরেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে ছিল। সেই ব্যক্তি দেখে যে, তার পিঠের ওপরের অংশের চামড়া খুবই শক্ত ও খসখসে যেমনটি মহিষের চামড়া হয়ে থাকে। সেই ব্যক্তি এটি দেখে অবাক হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে, তোমার এই রোগ কবে থেকে হল? তোমার পিঠের চামড়া তো পশুর চামড়ার মত। একথা শুনে তিনি হেসে ওঠেন এবং বলেন, এটি কোন রোগ নয়। আমরা যখন ইসলাম ধর্ম

গ্রহণ করি তখন আমাদের মনিব আমাদেরকে শাস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর প্রচণ্ড রোদে আমাদেরকে শুইয়ে দিয়ে প্রহার করতে আরম্ভ করতো এবং বলতো, তোমরা বল 'মুহাম্মদ (সা.)-কে আমরা মানি না'। আমরা কলেমা শাহাদত পড়ে এর উত্তর দিতাম। এরপর সে আবার আমাদেরকে মারতে আরম্ভ করতো। এভাবেও যখন তার রাগ প্রশমিত হতো না তখন আমাদেরকে পাথরের ওপর দিয়ে টানা-হেঁচড়া করা হতো। তিনি (রা.) লিখেন, আরবে কাঁচা বা মাটির ঘরগুলোকে পানির (প্রকোপ) থেকে রক্ষা করার জন্য বাড়ির পাশে এক ধরনের পাথর ফেলা হতো যাকে পাঞ্জাবিতে 'খিংগার' বলে। এই পাথর খুবই খরখরে ও চোখা হয়ে থাকে এবং লোকেরা এ পাথর প্রাচীরের গায়েও লাগাতো যেন পানি বেয়ে পড়লেও দেয়ালের ক্ষতি না হয়। যাহোক, সেই সাহাবী বলেন, আমরা যখন ইসলাম পরিত্যাগ করতাম না তখন লোকেরা আমাদেরকে মারতে মারতে ক্লান্ত হয়ে যেত, এরপর আমাদের পায়ে রশি বেঁধে এই খরখরে ও ধারালো পাথরের ওপর দিয়ে টানাহেঁচড়া করা হতো। বস্তুত তুমি এখন যা দেখছ তা সেই মারধোর ও ছেচড়ানোরই ফল। মোটকথা, বছরের পর বছর তাদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়। অবশেষে হযরত আবু বকর (রা.) এটি আর সহ্য করতে না পেরে নিজের সম্পত্তির বৃহদাংশ বিক্রি করে তাকে মুক্ত করিয়ে দেন।"

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২২, পৃ: ৫৪৬-৫৪৭)

হযরত আবু বকর (রা.)'র দাসমুক্তির উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) বলেন, "এসব ক্রীতদাস যারা মহানবী (সা.)-এর প্রতি ঈমান আনয়ন করেছিল তারা বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির লোক ছিল। তাদের মধ্যে হাবশীও ছিল যেমন বেলাল (রা.), রোমানও ছিল যেমন সুহায়েব (রা.), এছাড়া এদের মাঝে খ্রিস্টানও ছিল যেমন হযরত জুবায়ের ও সুহায়েব (রা.) এবং এদের মাঝে মুশরিকও ছিলেন, যেমন বেলাল ও আম্মার। বেলাল (রা.)'র মনিব তাঁকে তপ্ত বালুতে শুইয়ে দিয়ে তার ওপর হয় পাথর চাপিয়ে দিত কিংবা কিশোরদেরকে তার বুকে লাফানোর জন্য নিযুক্ত করে দিত।..... হযরত আবু বকর (রা.) যখন তার ওপর এহেন নির্যাতন হতে দেখেন তখন তিনি তার মনিবকে মুক্তিপণ দিয়ে তাকে মুক্ত করে দেন।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ১৯৩-১৯৪)

হযরত আবু বকর (রা.) একবার ইথিওপিয়ায় হিজরতের ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে বর্ণিত আছে যে, মুসলমানদের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পায় এবং ইসলাম প্রকাশিত হয় তখন কুরাইশ কাফিররা তাদের মধ্য থেকে নিজ নিজ গোত্রের ঈমান আনয়নকারীদের ওপর নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতন করতে লাগল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল তাদেরকে মুরতাদ বানানো। তখন মহানবী (সা.) মু'মিনদেরকে বলেন, তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদেরকে একত্রিত করে দিবেন। সাহাবীরা নিবেদন করেন, আমরা কোথায় যাব? তিনি (সা.) বলেন, ঐদিকে আর মহানবী (সা.)-এর নির্দেশে এগারোজন পুরুষ এবং চারজন মহিলা হাবশা বা ইথিওপিয়া অভিমুখে হিজরত করেন।

(শারাহ যারকানি আলাল মোয়াহিবুল লাদানিয়া, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫০৩-৫০৪)

মুসলমানরা হাবশার দিকে হিজরত করার পরে হযরত আবু বকর (রা.)-কেও কষ্ট দেওয়া হয়। তাই তিনি হাবশার উদ্দেশ্যে হিজরতের ইচ্ছা পোষণ করেন। অতএব, এ বিষয়ে বুখারীর রেওয়ায়েত হল, হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, যখন মুসলমানদেরকে কষ্ট দেওয়া হয় তখন হযরত আবু বকর (রা.) হিজরত করার উদ্দেশ্যে হাবশা অভিমুখে যাত্রা করেন। যখন তিনি মক্কা থেকে পাঁচ রাতের দুরত্বে সমুদ্র তীরবর্তী স্থানে অবস্থিত ইয়েমেনের বারকুর রিমাদ শহরে পৌঁছেন সেখানে ইবনে দাগিনার সাথে সাক্ষাৎ হয়, যে কারা গোত্রের সর্দার ছিল। সে জিজ্ঞেস করে, হে আবু বকর! কোথায় যাচ্ছ? হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমার জাতি আমাকে বের করে দিয়েছে আর আমি চাই ভূপৃষ্ঠে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে আমার প্রভুর ইবাদত করতে। ইবনে দাগিনা বলল, তোমার মতো মানুষ নিজ থেকে তো দেশ থেকে বের হওয়ার কথা না এবং তাকে বহিস্কার করাও উচিত না। তুমি তো সেসব পুণ্যকর্ম কর যা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে আর তুমি আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা কর, দুর্বলদের বোঝা বহন কর, অতিথি আপায়্যন কর এবং বিপদ ক্লিষ্টদের সাহায্য কর। একস্থানে এভাবে অনুবাদ করা হয়েছে যে, তুমি নিঃস্ব বা কাঙ্গালদের জীবিকার ব্যবস্থা কর, আত্মীয়দের সাথে উত্তম আচরণ কর, অসহায়দের আশ্রয় দাও, অতিথিপরায়ণ এবং প্রকৃত অর্থে সমস্যা কবলিতদের সাহায্য কর। এরপর সে বলে, আমি তোমাকে নিরাপত্তা দিচ্ছি। ফিরে চল এবং নিজ দেশেই স্বীয় প্রভুর ইবাদত কর। অতএব, ইবনে দাগিনাও হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে মক্কায় আসে এবং কুরাইশের কাফির সর্দারের সাথে সাক্ষাত করে তাদেরকে বলল আবু বকর এমন ব্যক্তি যে তার মত মানুষ দেশ থেকে বের হয় না আর তাকে দেশান্তরিত করাও যায় না। তোমরা কি এমন ব্যক্তিকে দেশ থেকে বহিস্কার করছে যে এমন সব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী যা আজকাল বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আর সে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী, দুর্বলদের বোঝা বহনকারী, অতিথিপরায়ণ এবং বিপদ ক্লিষ্টদের সাহায্যকারী। তখন কুরাইশরা ইবনে দাগিনার নিরাপত্তা প্রদান মেনে নেয় এবং হযরত আবু বকর (রা.)-কে নিরাপত্তা দেয় আর ইবনে দাগিনাকে বলে, আবু বকরকে বলে দাও! সে যেন তার প্রভুর ইবাদত নিজ ঘরে বসেই করে এবং সেখানেই নামায পড়বে আর যা চাইবে পাঠ করবে। কিন্তু আমাদেরকে যেন নিজের ইবাদত এবং কুরআন পাঠের মাধ্যমে কষ্ট না দেয় এবং উঁচু আওয়াজে না পাঠ করে কেননা, আমাদের ভয় হয়, পাছে আমাদের ছেলে-মেয়ে, স্ত্রীদের আবার পথভ্রষ্ট না করে ফেলে। ইবনে দাগিনা আবু বকর (রা.)-কে এগুলো বলে দিল। তখন হযরত আবু বকর (রা.) নিজের বাড়িতেইস্বীয় প্রভু র ইবাদত করতে লাগলেন এবং নিজের বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও প্রকাশ্যে নামায আদায় এবং কুরআন তিলাওয়াত করতেন না। এর কিছু সময় পর হযরত আবু বকর (রা.)'র ভাবনায় পরিবর্তন আসে, তিনি তাঁর বাড়ির উঠানে একটি মসজিদ অর্থাৎ, নামায পড়ার স্থান বানিয়ে নেন এবং উন্মুক্ত স্থানে বের হ ন। সেখানে নামাযও পড়তেন এবং কুরআন তিলাওয়াতও করতেন। আর মুশরিক মহিলা এবং শিশুরা তার কাছে ভিড় জমাতো আর হযরত আবু বকর (রা.)-কে দেখে তারা আশ্চার্যান্বিত হত এবং দেখতো যে, তিনি খুবই ক্রন্দনশীল মানুষ।

যখন কুরআন তিলাওয়াত করতেন তখন অশ্রু ধরে রাখতে পারতেন না। এই পরিস্থিতি কুরাইশের মুশরিক নেতাদেরকে চিন্তিত করে তোলে এবং তারা ইবনে দাগিনাকে ডেকে আনে। সে তাদের কাছে আসলে তারা তাকে বলল, আমরা তো আবু বকরকে এই শর্তে নিরাপত্তা দিয়েছিলাম যে, সে নিজ ঘরে তাঁর প্রভুর ইবাদত করবে, কিন্তু তিনি এই শর্তের সম্মান রক্ষা করেনি এবং নিজ বাড়ির উঠানে মসজিদ বানিয়েছে এবং প্রকাশ্যে নামায ও কুরআন তিলাওয়াত শুরু করেছে। তিনি আমাদের শিশু ও নারীদের পরীক্ষায় ফেলবেন বলে আমাদের শংকা হয়। তুমি তাঁর কাছে যাও। তিনি যদি নিজের ঘরের ভেতরে থেকে তঁ ার প্রভুর ইবাদত করতে পছন্দ করেন তাহলে তা করতে পারেন, নতুবা তিনি যদি প্রকাশ্যে ইবাদত করার ক্ষেত্রে অটল থাকেন তাহলে তঁ াকে বল, সে যেন তোমার দেওয়া নিরাপত্তা তোমাকে ফিরিয়ে দেয়। কেননা,এটি আমাদের পছন্দ নয় যে, তোমার দেওয়া নিরাপত্তা লঙ্ঘন করবে। আবু বকরকে আমরা কখনও প্রকাশ্যে ইবাদত করতে দিব না। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, ইবনে দাগেনা হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে আসে এবং বলে, আপনি সেই শর্তের কথা জানেন যার প্রেক্ষিতে আমি আপনাকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম। তাই হয় আপনি উক্ত প্রতিশ্রুতির গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকুন নতুবা আমার দেওয়া নিরাপত্তা (আমাকে) ফিরিয়ে দিন, কেননা আমি চাই না, আরবরা এই কথা শুনবে যে, আমি যে ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়েছিলাম তার সাথে আমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছি। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আমি তোমার দেওয়া আশ্রয় তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি আর আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়েই সন্তুষ্ট।

(সহী বুখারী, কিতাবুল কাফালাহ, হাদীস-২২৯৭) (সহী বুখারী, উর্দু অনুবাদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৭৬) (ফারহাঙ্গে সীরাত, পৃ: ৫৭)

হযরত আবু বকর (রা.) নিজের উঠানে যে মসজিদ বানিয়েছিলেন সেটি সম্পর্কে সহীহ্ বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ উমদাতুল ক্বারী'তে লিখা আছে যে, এই মসজিদটি ঘরের দেয়াল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল আর এটি ইসলাম ধর্মে নির্মিত প্রথম মসজিদ ছিল।

(উমদাতুল ক্বারী, খণ্ড-১২, পৃ: ১৮৫)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, আবু বকর (রা.)'র ন্যায় মানুষ, পুরো মক্কা যার অনুগ্রহের কাছে ঋণী ছিল, তিনি যা কিছু উপার্জন করতেন তা দাস মুক্ত করার পেছনে ব্যয় করতেন। তিনি একদা মক্কা ছেড়ে যাচ্ছিলেন, এমন সময় পথিমধ্যে এক নেতার সাথে তঁ ার সাক্ষাৎ হয়। আর সে জিজ্ঞেস করে, হে আবু বকর! তুমি কোথায় যাচ্ছ? তিনি বলেন, এই শহরে এখন আর আমার জন্য নিরাপত্তা নেই। আমি এখন অন্য কোথাও চলে যাচ্ছি। সেই নেতা বলে, তোমার মতো পুণ্যবান মানুষ যদি শহর ছেড়ে চলে যায় তাহলে এই শহর ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি তোমাকে আশ্রয় প্রদান করছি, তুমি শহর ছেড়ে যেও না। তিনি সেই নেতার আশ্রয়ে শহরে ফিরে আসেন। তিনি যখন সকালে উঠতেন আর কুরআন পাঠ করতেন তখন নারী ও শিশুরা দেওয়ালের সাথে কান পেতে কুরআন শুনতো, কেননা তার কণ্ঠে ছিল পরম কোমল, মর্মস্পশী ও বেদনাঘন। পবিত্র কুরআন যেহেতু আরবী ভাষায় ছিল তাই সকল নারী, পুরুষ ও শিশুরা এর অর্থ বুঝতে পারত এবং শ্রোতারা এতে প্রভাবিত

হতো। একথা যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন মক্কায় এই হৈচৈ আরম্ভ হয় যে, এভাবে তো সবাই ধর্মচ্যুত হয়ে যাবে। অর্থাৎ পবিত্র কুরআন শুনে এবং তাঁর বিগলিত কণ্ঠ শুনে মানুষ ধর্মচ্যুত হয়ে যাবে।

একই অবস্থা আজকাল আহমদীদের সাথে কতিপয় দেশে হচ্ছে, বিশেষত পাকিস্তানে। অর্থাৎ যদি আহমদীদেরকে কুরআন পাঠ করতে বা নামায পড়তে কেউ দেখে ফেলে তাহলে তারা ধর্মচ্যুত হয়ে যাবে। তাই আহমদীদের জন্য নামায এবং কুরআন পাঠের ক্ষেত্রে খুবই কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে।

যাহোক, তিনি (রা.) বলেন, অবশেষে মানুষ সেই নেতার কাছে যায় এবং তাকে বলে, তুমি তাকে কেন আশ্রয় দিয়ে রেখেছ? সেই নেতা এসে হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলে, আপনি এভাবে (প্রকাশ্যে) কুরআন পাঠ করবেন না। মক্কার লোকেরা এতে অসন্তুষ্ট হয়। হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, তাহলে তুমি তোমার আশ্রয় ফিরিয়ে নাও। আমি এটি থেকে বিরত থাকতে পারব না। অতএব, সেই নেতা নিজ নিরাপত্তা ফিরিয়ে নেয়।

(তফসীরে কবীর, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩২৭)

শে'বে আবী তালিব-এ-ও হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিলেন। মক্কার কুরাইশরা একত্ববাদের বাণীকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য সম্ভাব্য সকল চেষ্টা করে। কিন্তু যখন তারা সকল দিক থেকে ব্যর্থ হয় তখন তারা একটি ব্যবহারিক পদক্ষেপ হিসেবে বনূ হাশেম ও বনূ মুত্তালিব এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ সম্পর্কে সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে লিখেন যে, কুরাইশরা একটি ব্যবহারিক পদক্ষেপ হিসেবে পরস্পর পরামর্শ করে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, মহানবী (সা.) এবং বনূ হাশেম ও বনূ মুত্তালিব গোত্রের সকল সদস্যের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করা হোক আর যদি তারা মহানবী (সা.)-কে নিরাপত্তা প্রদান করা থেকে বিরত না হয় তাহলে তাদেরকে একস্থানে অবরুদ্ধ করে ধ্বংস করা হোক। অতএব, সপ্তম নববী সনের মুহাররম মাসে রীতিমত একটি চুক্তিপত্র লেখা হয় যে, কোন ব্যক্তি বনূ হাশেম এবং বনূ মুত্তালিব গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখবে না। আর তাদের কাছে কেউ কিছু বিক্রিও করবে না, তাদের কাছ থেকে কিছু কিনবেও না। তাদের কাছে কোন খাদ্যসামগ্রী পৌঁছুতে দেবে না এবং তাদের সাথে কোন প্রকার সম্পর্ক রাখবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মুহাম্মদ (সা.)-এর কাছ থেকে পৃথক হয়ে তাঁকে (সা.) তাদের হাতে তুলে না দিবে। (বর্তমানে কোন কোন স্থানে কতিপয় আহমদীর সাথে উক্ত ব্যবহারই করা হচ্ছে) এই চুক্তি, যাতে কুরাইশদের সাথে বনূ কিনানাও অংশীদার ছিল, রীতিমতো লিপিবদ্ধ করা হয় এবং তাতে সকল বড় বড় নেতার স্বাক্ষর নেওয়া হয়, এরপর সটিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় অঙ্গীকারনামা হিসেবে কা'বা গৃহরে দেওয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। অতএব, মহানবী (সা.) এবং বনূ হাশেম ও বনূ মুত্তালিব গোত্রের সকল সদস্য, তা সে মুসলমান কিংবা কাফির, কেবল মহানবী (সা.)-এর চাচা আবু লাহাব ব্যতীত, যে কিনা চরম শত্রুতার কারণে কুরাইশদের সঙ্গ দিয়েছিল, শে'বে আবী তালিব-এ, যা একটি পাহাড়ী উপত্যকা ছিল, অবরুদ্ধ হয়ে যায়। আর এভাবে যেন কুরাইশদের বড় বড় দু'টি গোত্র মক্কার সামাজিক জীবনযাত্রা থেকে কার্যত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং শে'বে আবি তালিব-এ, যা বনূ হাশেম গোত্রের গোত্রীয় উপত্যকা বা গিরিপথ ছিল, কয়েদীদের ন্যায় নজরবন্দী হয়ে যায়। গুটিকতক অন্য মুসলমান, যারা সেসময় মক্কায় অবস্থান করছিল তারাও মহানবী (সা.)-এর সাথে ছিল। "

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ, পৃ: ১৬৬)

এহেন কঠিন পরিস্থিতিতেও হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নি। অতএব,হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ্ (রাহে.) বলেন, কুরাইশরা যখন মহানবী (সা.)-কে কষ্ট দেওয়ার বিষয়ে একমত হয় এবং তারা একটি চুক্তিপত্র লিখে, তখন হযরত সিদ্দীক (রা.) সেই কষ্টের যুগেও মহানবী (সা.)-এর সঙ্গী ছিলেন। এ দৃষ্টিকোন থেকে এ ঘটনা সম্পর্কে আবু তালিব এই পঙক্তি বলেন,

هُمْ رَجَعُوا سَهْلَ ابْنَ بَيْضَاءَ رَاضِيًا فَسُرَّ أَبُوْ بَكْرٍ بِهَا وَمُحَمَّدٌ

(উচ্চারণ: হুম রাজাউ সাহাল ইবনা বায়যাআ রাযিয়ান, ফা সুররা আবু বকরীন বিহা ওয়া মুহাম্মাদ) অর্থ: আর তারা সাহ্ল বিন বায়যা'কে আনন্দিত করে ফেরত পাঠায় আর এতে আবু বকর (রা.) এবং মুহাম্মদ (সা.) আনন্দিত হন।

(ইযালাতুল ইখফা, প্রণেতা-হযরত শাহ ওলীউল্লাহ্, উর্দু অনুবাদ-ইশতেয়াক আহমদ দেওবন্দী, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৯-৪০) সৈয়্যদানা সিদ্দীকে আকবার কে শাব ও রোয, পৃ: ৩০)

অর্থাৎ, অবশেষে মক্কার কুরাইশরা যখন অবরোধ তুলে নেয় তখন আবু তালিব যে পঙক্তিসমূহ পাঠ করেছিলেন সেগুলোর মধ্যে উপরোল্লিখিত পংক্তিটি ছিল একটি। অর্থাৎ, বয়কট শেষ হওয়ায় মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) উভয়েই আনন্দিত হন। ***'গুলেবাতুর রউম'***-এর ভবিষ্যদ্বাণী এবং এতে হযরত আবু বকর (রা.)'র বাজি ধরা সম্পর্কেও বর্ণনা রয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আল্লাহ্ তা'লার বাণী, ***'গুলেবাতুর রুমু- ফি আদনাল আরয'*** সম্পর্কে রেওয়ায়েত হল 'গুলিবাত' এবং 'গালাবাত'। তিনি বলেন, মুশরিকরা রোমানদের বিরুদ্ধে পারস্যবাসীদের বিজয় লাভ করা পছন্দ করতো , কেননা এরা এবং তারা মূর্তিপূজারী ছিল। আর মুসলমানরা পারস্যবাসীদের বিরুদ্ধে রোমানদের বিজয় লাভ করা পছন্দ করতো, কেননা তারা আহলে কিতাব ছিল। তারা এর উল্লেখ হযরত আবু বকর (রা.)র কাছে করে আর হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর নিকট এর উল্লেখ করলে তিনি (সা.) বলেন, তারা অবশ্যই বিজয় লাভ করবে। হযরত আবু বকর (রা.) যখন একথা তাদেরকে অর্থাৎ মুশরিকদের বলেন তখন তারা বলে, আমাদের এবং তোমাদের মাঝে একটি সময় নির্ধারণ করে নাও, অর্থাৎ বিরুদ্ধবাদী ও মুশরিকদের সাথে। আমরা যদি বিজয় লাভ করি তাহলে আমাদের জন্য এটি এবং ওটি হবে। আর যদি তোমরা বিজয়ী হও তবে তোমাদের জন্য এটি এবং ওটি হবে, অর্থাৎ এই শর্তে বাজি ধরে। যাহোক, তারা পাঁচ বছর সময় নির্ধারণ করে, কিন্তু তারা (অর্থাৎ রোমানরা) বিজয় লাভ করতে পারে নি। তারা তখন মহানবী (সা.)-এর নিকট এর উল্লেখ করে। তিনি (সা.) বলেন, তোমরা আরও বেশি সময় কেন নির্ধারণ কর নি? বর্ণনাকারী বলেন, আমার মনে হয় তাঁর (সা.) কথার অর্থ ছিল ১০ বছর। এটি তিরমিযীর তফসীরের বর্ণনা।

(সুনান তিরমিযি, আবওয়াবুত তফসীর, হাদীস-৩১৯৩)

সহীহ বুখারীর একটি রেওয়ায়েতে মহানবী (সা.)-এর এমন চারটি ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করা হয়েছে যা অত্যন্ত মহিমারসাথে পূর্ণ হয়েছে। এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলোর মাঝে রোমের বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণীও রয়েছে। যেমন মাসরূক বর্ণনা করেন যে, আমরা আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রা.)'র কাছে ছিলাম। তিনি বলেন, মহানবী (সা.) যখন মানুষকে সত্যবিমুখ হতে দেখেন তখন তিনি বলেন, হে আল্লাহ্ যেভাবে ইউসুফ (আ.)-এর যুগে সাত বছর (দীর্ঘ) দুর্ভিক্ষ হয়েছিল তাদের ওপরও তেমনই দুর্ভি ক্ষ চাপাও। অতএব, তাদের ওপরও সেরূপ দুর্ভিক্ষ আসে যা সব কিছু ধ্বংস করে দেয়। এমনকি অবশেষে তারা চামড়া, মৃতপ্রাণী ও দুর্গন্ধযুক্তমৃতদেহও ভক্ষণ করে। আর তাদের মাঝে কেউ আকাশের দিকে তাকালে ক্ষুধার কারণে চোখে অন্ধকার দেখতে পেতো। এটি সেই চারটি ভবিষ্যদ্বাণীর মধ্য হতে একটি ঘটনা। (তখন) আবু সুফিয়ান মহানবী (সা.)-এর কাছে আসে এবং বলে, হে মুহাম্মদ (সা.) আপনি তো আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্য এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার নির্দেশ দিয়ে থাকেন, কিন্তু দেখুন! আপনার জাতি ধ্বংসের মুখে। আপনি আল্লাহ্র নিকট তাদের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, অতএব তোমরা সেই দিনের অপেক্ষা কর যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়া নিয়ে আসবে। নিশ্চয় তোমরা এই বিষয়গুলোরই পুনরাবৃত্তি করবে। যেদিন আমরা কঠোর পাকড়াও করব। অতএব, এই কঠোর পাকড়াও বদরের দিন হয়েছিল। অতএব, ধোঁয়ার শাস্তি এবং কঠোর পাকড়াও আর লেজামান বা পিছুধাওয়াকারী ভবিষ্যদ্বাণী এবং রোম সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণী-সবই পূর্ণ হয়েছে। এটি বুখারীর রেওয়ায়েত।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ইসতেসকা, হাদীস-১০০৭)

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদর উদ্দীন আইনী রোমের বিজয় সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন যে, যখন পারস্য এবং রোমান সম্রাজ্যের মাঝে যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন মুসলমানরা পারস্যের বিপক্ষে রোমানদের বিজয় চাচ্ছিল। কেননা, রোমানরা আহলে কিতাব ছিল, কিন্তু কুরাইশ কাফিররা পারস্যবাসীদের বিজয় চাচ্ছিল, কেননা তারা অগ্নি উপাসক ছিল আর কুরাইশরাও মূর্তিপূজা করতো। অতএব, এই বিষয়ে হযরত আবু বকর (রা.) এবং আবু জাহলের মাঝে বাজি ধরা হয়। অর্থাৎ, তারা কোন বিষয়ে পরস্পরের মাঝে কয়েক বছরের মিয়াদ নির্ধারণ করে নেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, 'বিষউন' তো সাত বা নয় বছরের মেয়াদ হয়ে থাকে, তাই সময় বাড়িয়ে নাও - এখানে 'বিষউন' শব্দ রয়েছে। এরপর হযরত আবু বকর (রা.) তা-ই করেন। অতঃপর, রোমানরা বিজয়ী হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

الٓمّٓ ۔ غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۔ فِيْٓ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۔ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ۔ لِلّٰهِ الْاَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْۢ بَعْدُ ۔ وَيَوْمَئِذٍ يَّفْرَحُ الْمُؤْمِنُوْنَ ۔ بِنَصْرِ اللّٰهِ (الروم:2 تا 6)

অর্থ হল, আলিফ-লাম-মিম। এর পূর্ণ বাক্য হলো আনাল্লাহু আ'লামু অর্থাৎ, আমি আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশি জ্ঞান রাখি। রোমানদের নিকটবর্তী

দেশে পরাস্ত করা হয়েছে এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর পুনরায় অবশ্যই বিজয়ী হবে, তিন থেকে নয় বছরের মধ্যে। পূর্বে ও পরে সিদ্ধান্ত আল্লাহ্‌রই চলে এবং সেদিন মু'মিনরাও নিজেদের বিজয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হবে, যা আল্লাহ্‌র সাহায্যে (লাভ) হবে। (সূ রা আর্‌রূম: ২-৬) আর শা'বী বলেন, তখন বাজি ধরা বিধিসম্মত ছিল।

(উমদাতুল ক্বারী, শারাহ বুখারী, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৪৬)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এ সম্পর্কে লিখেন, ইসলামের পূর্বে এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগে সমগ্র সভ্য পৃথিবীতে সবথেকে বেশি শক্তিশালী এবং সবার চেয়ে বেশি বিস্তৃত সাম্রাজ্য ছিল দু'টি। পারস্য সাম্রাজ্য এবং রোমান সাম্রাজ্য। আর এই উভয় সাম্রাজ্য আরবের নিকটেই অবস্থিত ছিল। পারস্য সাম্রাজ্য আরবের উত্তর-পূর্ব দিকে আর রোমান সাম্রাজ্য ছিল উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। যেহেতু এই দু 'ই সাম্রাজ্যের সীমানা পরস্পর লাগোয়া ছিল তাই অনেক ক্ষেত্রে উভয় সাম্রাজ্যেরমাঝে পারস্পরিক যুদ্ধবিগ্রহ লেগে যেত। সেই যুগের ঘটনা যখন এ উভয় সাম্রাজ্য পারস্পরিক যুদ্ধে লিপ্ত ছিল, এটি সে যুগের কথা যখন উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল আর পারস্য সাম্রাজ্য রোমান সাম্রাজ্যকে পদানত করে রেখেছিল এবং তাদের (তথা রোমানদের) অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ছিনিয়ে নিয়েছিল এবং তাদেরকে অব্যাহতভাবে কোণঠাসা করতে থাকত। কুরাইশরা ছিল মূর্তিপূ জারী এবং পারসীরা প্রায় একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী ছিল। তাই মক্কার কুরাইশরা পারস্যের ঐসব বিজয়ে ছিল ভীষণ উৎফুল্ল। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের প্রতি মুসলমানদের সহমর্মিতা ছিল কেননা, রোমান সাম্রাজ্য ছিল খ্রিস্টান এবং খ্রিস্টানরা আহলে কিতাব হওয়ায় এবং হযরত মসীহ্ নাসেরীর সাথে সম্পর্ক থাকায় প্রতিমাপূ জারী এবং অগ্নিপূজারী জাতির তুলনায় মুসলমানদের অনেক কাছের ছিল। এমতাবস্থায় মহানবী (সা.) আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে জ্ঞান লাভ করে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, এখন তো রোমানরা পারসীয়দের দ্বারা পরাভূত হচ্ছে কিন্তু আগামী কয়েক বছরের মধ্যে তারা পারস্যের ওপর বিজয় লাভ করবে আর সেদিন মু'মিনরা আনন্দিত হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী শুনে মুসলমানরা, যাদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.)'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, মক্কায় সর্বসাধারণের মাঝে ঘোষণা দিতে আরম্ভ করেন যে, আমাদের খোদা জানিয়েছেন, 'অচিরেই রোমানরা পারস্যের ওপর বিজয় লাভ করবে'। কুরাইশরা প্রত্যুত্তরে বলে, যদি এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্যি হয়ে থাকে তাহলে চলো বাজি ধরি। তখনও যেহেতু ইসলামে বাজি ধরা নিষেধ ছিল না তাই হযরত আবু বকর (রা.) তাদের শর্ত মেনে নেন, ফলে কুরাইশ নেতৃবর্গ এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র মাঝে জয়-পরাজয়ের বাজি হিসেবে কয়েকটি উট নির্ধারিত হয় এবং ছয় বছরের মিয়াদকাল নির্ধারিত হয়। কিন্তু মহানবী (সা.) যখন এ বিষয়ে জানতে পারেন তখন তিনি (সা.) বলেন, ছয় বছর সময় নির্ধারণ করা ভুল। আল্লাহ্ তা'লা সময়সীমা সম্পর্কে '***বিজই সিনীন***' শব্দ ব্যবহার করেছেন এবং আরবী বাগধারায় এই শব্দদ্বয় তিন থেকে নয়-এর জন্য বলা হয়ে থাকে। এই (বাজি ধরার) ঘটনা সেই যুগের, যখন মহানবী (সা.) মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন অর্থাৎ, তখনও হিজরত করা হয় নি। এই নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই (তথা নয় বছরের মধ্যেই) যুদ্ধের মোড় হঠাৎ ঘুরে যায় আর পারস্য রোমানদেরকে পরাভূত করে স্বপ্নকালেই নিজেদের সমস্ত এলাকা পুনরুদ্ধার করে। এটি [মহানবী (সা.)-এর] হিজরতের পরের ঘটনা।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ, পৃ: ২১৬-২১৭)

হিজরতের পরেই রোমানরা বিজয় লাভ করে।

এ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ ম ওউদ (রা.) বলেন, মহানবী (সা.) তখনও মক্কাতেই অবস্থান করছিলেন, এ সময় আরবে এই সংবাদ প্রচারিত হয় যে, ইরানীরা রোমানদেরকে পরাজিত করেছে। এতে মক্কাবাসী খুবই উৎফুল্ল হয় (এই বলে যে,) আমরাও মুশরিক এবং ইরানীরাও মুশরিক। ইরানীদের রোমানদেরকে পরাভূত করা শুভলক্ষণ আর এর অর্থ দাঁড়ায়, মক্কাবাসীও মুহাম্মদ (সা.)-এর বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করবে। (তারা এই শুভ লক্ষণ প্রকাশ পাবে বলে ধরে নেয়)। কিন্তু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۙ فِيْۤ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۙ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ؕ (সূরা আর্ রূম: ২-৫) রোমান সেনাবাহিনী সিরিয়ার অঞ্চলে নিঃসন্দেহে পরাভূত হয়েছে, কিন্তু এই পরাজয়কে তোমরা চূড়ান্ত পরাজয় মনে কর না, পরাভূত হওয়ার পর আগামী নয় বছরের মধ্যে বিজয় লাভ করবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী প্রকাশ পেলে মক্কাবাসী মুসলমানদের নিয়ে অনেক বেশি হাসি-ঠাট্টা ও বিদ্রুপ করে এমনকি তাদের অনেকে হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে একশ' উট বাজি ধরে অর্থাৎ. এত বড় পরাজয় বরণের পরও যদি রোমানরা উন্নতি করতে সক্ষম হয় তাহলে আমরা তোমাকে একশ' উট দিব। আর যদি এ ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত না হয় তাহলে তুমি আমাদেরকে একশ' উট দিবে। যদিও বাহ্যত এ ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়াসুদূর পরাহত মনে হচ্ছিল। সিরিয়া পরাজয়ের পর রোমান সেনারা লাগাতার কয়েকটি পরাজয়ের কারণে পিছু হটতে থাকে, এমনকি ইরানী সেনাদল মারমুরা সমুদ্র উপকূলে পৌঁছে যায়। কন্সট্যান্টিনোপল নিজেদের এশিয়ান সাম্রাজ্য থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আর রোমানদের সুবিশাল সাম্রাজ্য কেবল একটি সামান্য রাজ্যের রূপ নেয়। কিন্তু খোদার বাণী পূর্ণ হওয়ার ছিল আর তা পূর্ণ হয়েছে। চরম হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় রোমান সম্রাট নিজের সৈন্যসামন্ত নিয়ে চূড়ান্ত আক্রমনের জন্য কন্সট্যান্টিনোপল থেকে রওয়ানা হয় এবং এশিয়ান উপকূলে অবতরণ করে ইরানীদের সাথে একটি চূড়ান্ত আক্রমন রচনা করে। সেনা ও সমরাস্ত্র কম থাকা সত্ত্বেও রোমানরা পবিত্র কুরআনের ভবিষ্যদ্ববাণী অনুযায়ী ইরানীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে। আর ইরানী সেনাবাহিনী এমনভাবে পলায়ন করে যে, ইরানের সীমানার বাইরে তাদের অন্য কোথাও ঠাঁই হয় নি। এভাবেই আফ্রিকাও এশিয়ার বিজিত দেশসমূহ পুনঃরায় রোমান সাম্রাজ্যের অধীনে চলে আসে।

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ৪৪৫)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, যখন আবু বকর (রা.) আবু জাহল এর সাথে বাজি ধরেন এবং পবিত্র কুরআনের সেই ভবিষ্যদ্বাণীটি অর্থাৎ, غُلِبَتِ الرُّوْمُ ۙ فِيْۤ اَدْنَى الْاَرْضِ وَهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُوْنَ ۙ فِيْ بِضْعِ سِنِيْنَ ؕ (সূ রা আর্ রূম: ২-৫)শর্তের ভিত্তি স্বরূপ উপস্থাপন করেন আর তিন বছরকাল সময় বেঁধে দেন তখন তিনি (সা.) ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃতি অনুসারে চটজলদি তাঁর দূরদর্শীতা প্রদর্শন করেন এবং আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-কে শর্ত কিছুটা সংশোধন করতে বলেন যে, 'বিজই সিনীন' -রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং এর ব্যাপ্তি হতে পারে সর্বোচ্চ নয় বছর।"

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১০-৩১১)

অতঃপর রয়েছে গোত্রসমূহের সামনে মহানবী (সা.)-এর নিজেকে উপস্থাপন করা অর্থাৎ, নিজের দাবী উপস্থাপন করা আর হযরত আবু বকর (রা.)'র মহানবী (সা.)-কে সঙ্গ দেওয়ার বিষয়টি।

যখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর ধর্মকে জয়যুক্ত করতে চাইলেন এবং তাঁর নবীকে সম্মান ও মর্যাদা প্রদান করতে চাইলেন আর নিজের অঙ্গীকার পূর্ণ করতে চাইলেন, তখন মহানবী(সা.) একবার হজ্জের মৌসুমে বাইরে বের হ ন এবং আনসার গোত্র অওস ও খাযরাজের সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি হজ্জের মৌসুমে নিজের দাবি উপস্থাপন করেন, যেভাবে প্রত্যেক বছর হজ্জের মৌসুমে তিনি করতেন। একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে, হযরত আলী বিন আবী তালিব (রা.) বর্ণনা করেছেন, যখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবী (সা.)-কে নির্দেশ দেন, তিনি যেন আরবের জাতিসমূহের মাঝে নিজের দাবি বা নিজেকে উপস্থাপন করেন তখন আমি হযরত আবু বকর (রা.)'র সাথে মিনার উদ্দেশ্যে বের হই। একপর্যায়ে আমরা আরবদের এক সভায় উপস্থিত হই। হযরত আবু বকর (রা.) এগিয়ে যান আর যেহেতু তিনি বংশবৃক্ষ বা বংশতালিকা সম্পর্কে পারদর্শীতা রাখতেন তাই তিনি জিজ্ঞেস করেন, আপনারা কোন্ গোত্রের মানুষ? তারা উত্তর দেয়, রবী'য়া গোত্রের। হযরত আবু বকর (রা.) জিজ্ঞেস করেন, রবী'য়ার কোন শাখার? তারা বলে, যাহল শাখার। হযরত আলী (রা.) বলেন, এরপর আমরা অওস ও খাযরাজের সভায় যাই, এরাই সেসব মানুষ যাদেরকে মহানবী (সা.) আনসার উপাধি দিয়েছিলেন কেননা, তারা তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন ও সাহায্য-সহযোগিতার অঙ্গীকার করেছিলেন। হযরত আলী (রা.) বলেন,আমাদের সেখান থেকে ওঠার পূর্বেই তারা মহানবী (সা.)-এর হাতে বয়আ'ত করেন।

(শারাহ যারকানি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭২-৭৪)

অপর একটি রেওয়ায়েতে হযরত আলী (রা.) বর্ণনা করেন, যখন আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবী (সা.)-কে আরবের জাতি সমুহের সামনে নিজের দাবি উপস্থাপনের নির্দেশ দেন তখন তিনি (সা.) সে উদ্দেশ্যে বের হন। আমি ও আবু বকর (রা.)ও তাঁর সাথেই ছিলাম। আমরা একটি বৈঠকে গিয়ে উপস্থিত হই যেখানে শান্তি ও গাম্ভীর্য বিদ্যমান ছিল। এছাড়া তারা ক্ষমতাবান ও সম্মানিত ছিলেন। আবু বকর (রা.) তাদের জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কোন গোত্রের মানুষ? তারা বলে, আমরা বনী শা'বান বিন সালাবাহ্ গোত্রের। হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে বলেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য নিবেদিত। এই জাতির মাঝে এদের চেয়ে বেশি সম্মানিত আর কোন মানুষ নাই। তাদের মাঝে ছিলেন মাফরূক বিন উমর,মুসান্না বিন হারেসাহ্, হানী বিন কাবিসাহ্ ও নো'মান বিন শরীক। মহানবী (সা.) তাদের সামনে এই আয়াত পাঠ করেন,

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلَّا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْـًٔا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ۚ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ ؕ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۚ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ؕ ذٰلِكُمْ وَصّٰىكُمْ بِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ

(সূরা আল্ আন'আম : ১৫২)

এর অনুবাদ হল, তুমি বল, আস, আমি তা পড়ে শোনাই যা তোমাদের প্রভু তোমাদের ওপর হারাম করেছেন- তা হল এই যে, তোমরা তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না, এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা আবশ্যক করেছেন, এবং দারিদ্রের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদিগকে হত্যা করো না; আমরাই তোমাদেরকে রিয্ক দিয়ে থাকি এবং তাদেরকেও, এবং তোমরা কখনও অশ্লীলতার নিকট যেয়ো না, তা প্রকাশ্য হোক বা অপ্রকাশ্য; এবং কোন এমন প্রাণকে হত্যা করো না যাকে (হত্যা করা) আল্লাহ্ হারাম করেছেন, কেবলমাত্র ন্যায়পন্থা ব্যতিরেকে। এটি সেই বিষয়, যার তাকিদপূর্ণ আদেশ তিনি তোমাদেরকে দিচ্ছেন যেন তোমরা বিবেক খাটাও।

এটি শুনে মাফরূক বলে, এই বাণী পৃথিবীবাসীর নয়; যদি এটি তাঁর বাণী হতো তবে আমরা অবশ্যই তা জানতাম। এরপর মহানবী (সা.) এই আয়াত পাঠ করেন,

اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ (النحل:91)

অর্থাৎ, আল্লাহ্ নিশ্চয় ন্যায়বিচার ও দয়া এবং আত্মীয়সুলভ দানের আদেশ দিচ্ছেন এবং সর্বপ্রকার অশ্লীলতা ও মন্দকার্য এবং বিদ্রোহ করতে বারণ করছেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (সূরা আন্ নাহ্ল: ৯১)

এই বাণী শোনার পর মাফরূক বলে, হে কুরাইশ ভাই! আল্লাহ্র শপথ! আপনি উত্তম চারিত্রিক আদর্শ ও ভালো কাজের প্রতি আহ্বান করেছেন। নিঃসন্দেহে এমন জাতি কঠোর মিথ্যাবাদী যারা আপনাকে মিথ্যা বলে প্রত্যাখ্যান করেছে এবং আপনার বিরুদ্ধে পরস্পরকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে। মুসান্না বলে, হে আমার কুরাইশ ভাই! আমরা আপনার কথা শুনেছি। আপনি সর্বোত্তম কথা বলেছেন এবং আপনি যেসব কথা বলেছেন, সেগুলো আমাকে অবাক করেছে। কিন্তু কিসরার সাথে আমাদের একটি চুক্তি রয়েছে যে, না আমরা কোন নতুন কাজ করব আর না কোন নতুন কাজ সম্পাদনকারীকে আমরা আশ্রয় দেব। আর সম্ভবত আপনি আমাদেরকে যে কাজের প্রতি আহ্বান করছেন তা সেই কাজের অন্তর্ভু ক্ত যা স্বয়ং বাদশাহ্ও অপছন্দ করেন। যদি আপনি এটি চান যে, আরবের চতু র্দিকের লোকজনের মোকাবিলায় আমরা আপনাকে সাহায্য করি ও আপনার সুরক্ষা করি তাহলে আমরা এমনটি করব। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের উত্তরে কোন দোষ নেই, কেননা তোমরা সুস্পষ্টভাবে সত্য কথা বলেছ।

আল্লাহ্'র ধর্মের ওপর সে-ই প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে যাকে আল্লাহ্ তা'লা সকল দিক হতে পরিবেষ্টন করে রাখেন। অতঃপর মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র হাত ধরেন এবং উঠে রওয়ানা হন।

(মারেফাতুস সাহাবা লি আবি নঈম, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৩০৯-৩১০)

অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, তিনি (সা.) বলেন, তোমরা কি মনে কর? যদি স্বল্প সময়ের মধ্যে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে কিসরার ভূ মি ও দেশের উত্তরাধিকারী করেন এবং তাদের নারীদেরকে তোমাদের অধীনস্ত করেন, তবে কি তোমরা আল্লাহ্'র পবিত্রতা ও প্রশংসা কীর্তন করবে? এটি শুনে সে বলে, হে আল্লাহ্! আমরা প্রস্তুত আছি। অর্থাৎ তারা শপথ করে। খোদা তা'লার মহিমা দেখুন! এই কথা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হয়েছে আর সেই মুসান্না, যে সে সময় কিসরার ক্ষমতার কারণে এত ত্রস্ত ছিলেন যে, তার অসন্তুষ্টির ভয়ে ইসলাম গ্রহণে ইতস্তত করছিলেন, কিছুকাল পর হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফতকালে সেই কিসরার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ইসলামী সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি এই মুসান্না বিন হারেসা-ই ছিলেন যিনি কিসরা বাহিনীর কোমর ভেঙ্গে দিয়েছিলেন এবং মহানবী (সা.)-এর সুসংবাদের সত্যায়নকারী বা সত্যায়নস্থলে পরিণত হয়েছিলেন।

(সৈয়্যদানা আবু বাকার সিদ্দীক, শখসীয়াত অউর কারনামে, উর্দু অনুবাদ: পৃ: ৮২-৮৪)

অনুরূপভাবে অপর এক হজ্জের সময়কার রেওয়ায়েত হল, যখন বকর বিন ওয়ায়েল গোত্র হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় আসে তখন মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, আপনি তাদের কাছে যান এবং তাদের সামনে আমাকে উপস্থাপন করুন অর্থাৎ, তাদেরকে তবলীগ করুন, আমার দাবি উপস্থাপন করুন। হযরত আবু বকর (রা.) তাদের নিকট গিয়ে মহানবী (সা.)-কে তাদের সামনে উপস্থাপন করেন। এরপর মহানবী (সা.) তাদের কাছে ইসলামের তবলীগ করেন।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭)

বাকি আলোচনা ইনশাআল্লাহ্ ভবিষ্যতে করা হবে।

আজ আমি আফগানিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়ার আবেদন করছি। বহু কষ্টের মধ্যে দিয়ে (তারা) দিন পার করছেন। বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। তাদের বাড়ির মহিলা ও শিশুরা উৎকণ্ঠার মধ্যে রয়েছে। যেসব পুরুষ গ্রেফতার হয় নি, তারা গ্রেফতার হওয়ার ভয়ে বাড়ি ছাড়া। আল্লাহ্ তাদের জন্য সহজসাধ্যতা সৃষ্টি করুন এবং তাদেরকে এই সমস্যা থেকে মুক্ত করুন।

পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন। সাধারণভাবে সেখানেও অবস্থা খারাপই থাকে। কোথাও না কোথাও কোন না কোন ঘটনা ঘটতেই থাকে, যেখানে লোকেরা আহমদীদের কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে। অনুরূপভাবে মোটের ওপর দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা যেন জগদ্বাসীকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে চেনার তৌফিক দান করেন এবং সকল অনিষ্টের মূল উৎপাটন করেন আর বিশ্ববাসী যেন তাদের সৃষ্টিকর্তাকে চিনতে সক্ষম হয়।

এরপর আমি কয়েকজন প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব আর পরে তাদের গায়েবানা জানাযা পড়াব। (তাদের মধ্যে) প্রথম স্মৃতিচারণ আলহাজ্ব আব্দুর রহমান আয়নন সাহেবের। তিনি ঘানা জামা'তের সাবেক সেক্রেটারী উমুরে আম্মা ও অফিসার জলসা সালানা ছিলেন। ঘানিয়ান ছিলেন, ৮১ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ। তার পিতামাতা উভয়েই আহমদী ছিলেন, অর্থাৎ, তার পিতামাতা আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মিশর থেকে উচ্চাশিক্ষা অর্জন করেন আর মিশর থেকে উচ্চশিক্ষা অর্জনের পর তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। ঘানাতে ফিরে এসে এখানে বড় বড় কোম্পানীতে ম্যানেজার পদে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি নাইজেরিয়াতেও কিছু দিন কাজ করেছেন আর পরে নিজেই কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন, যার ম্যানেজিং ডাইরেক্টর ছিলেন তিনি। অত্যন্ত পুণ্যবান ও নিষ্ঠাবান মানু ষ ছিলেন। তিনি জামা'তের অনুকরণীয় সেবা করার সৌভাগ্য পেয়েছেন। সারাজীবন তিনি জামা'তের স্বার্থ ও কাজকে নিজস্ব কাজের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন, বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত থেকে দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করতে থাকেন। সব সময় জামা'তের আমীরের আনুগত্য করা এবং সকল ডাকেসাড়া দেওয়াকে নিজের সৌভাগ্য মনে করতেন। প্রায় সময় সকালে মিশন হাউজে এসে আমীর সাহেবের কাছ থেকে জেনে নিতেন আর যদি কোন জামা'তী কাজ থাকত তাহলে তা আগে শেষ করতেন এবং এরপর তিনি নিজের কাজে যেতেন। দীর্ঘদিন তিনি বৃহত্তর আকরা অঞ্চলের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ১৯৭৯ থেকে ১৯৯৮ সন পর্যন্ত তিনি মজলিসে আনসারুল্লাহ্র সদর ছিলেন আর এরপর দীর্ঘকাল তিনি সেক্রেটারী উমু রে আম্মা হিসেবে কাজ করেন, এছাড়া অফিসার জলসা সালানা হিসেবেও তিনি দায়িত্ব পালনের সৌভাগ্য লাভ করেন। মৃত্যুকালে তিনি ন্যাশনাল ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। যে কারও সেবা করার জন্য তিনি সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন, অত্যন্ত দানশীল ছিলেন।

সহানুভূতি কেবল নিজ পরিবারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং তার বদান্যতা বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়স্বজন ছাড়াও জামা'তের বিভিন্ন সদস্য এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের উর্ধ্বে থেকে পাড়ার লোকদের পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। জামা'তের প্রতি বিশ্বস্ত এবং খিলাফতের জন্য নিবেদিতপ্রাণ সৈনিক ছিলেন। জামা'তের স্বার্থকে অন্য সবকিছুর ওপর প্রধান্য দিতেন আর কখনোই কোন বিরোধীর তোয়াক্কা করেন নি। তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ছিলেন এবং নিয়মিত তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন আর সফরে ও গৃহে থাকা অবস্থায় এর ওপর আমল করতেন। ওসীয়্যতকারী ছিলেন এবং নিয়মিত চাঁদা প্রদান করতেন। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও ৫জন পুত্র ও ৫জন কন্যা রেখে গেছেন।

ঘানার মুরব্বী হাফিয মুবাশ্বের আহমদ লিখেন, তিনি খুবই বিচক্ষণ ছিলেন আর অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও যৌক্তিক কথা বলতেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে বিষয়ের গভীরে পৌঁছে যেতেন। তিনি বলেন, একবার বোর্ড মিটিং-এর সময় সবাই যার যার মত মতামত ব্যক্ত করছিল। একটি বিষয় ছিল যা প্রলম্বিত করা হচ্ছিল, তিনি নীরবে শুনছিলেন কিন্তু তার পালা এলে তিনি বলেন, এ সম্পর্কে যুগ খলীফার পক্ষ থেকে একটি সিদ্ধান্ত এসে গেছে, তাই আমাদের বিতর্ক করার কোন প্রয়োজনই নেই। কেননা, যুগ খলীফার পক্ষ থেকে কোন সিদ্ধান্ত এসে গেলে এরপর আর কোন মন্তব্য করা ঠিক না বরং আমাদের উচিত অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করা। দূর-

এরপর ৯এর পাতায়....

অতএব, তাদেরকে অনেক বেশি মনোযোগ সহকারে কাজ করতে হবে। তিনি এই ঐশী জলসার গুরুত্ব ও কল্যাণ সম্পর্কে আলোচনা করেন। জলসার কাজকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য যে তিনটি প্রধান বিভাগ রয়েছে, সেই তিনটি বিভাগের অধীনে থাকা কর্মীদের দায়িত্বাবলী সম্পর্কে মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি সকল কর্মীবৃন্দকে পরিশ্রম ও দায়িত্বের সঙ্গে কাজ করার এবং যথাসময়ে কর্তব্য পালনের উপদেশ দেন। নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এছাড়াও নামায বা-জামাতে যেন কোনও প্রকার শিথিলতা না থাকে এবং যথা সময়ে নামায পড়া হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখার নির্দেশ দেন। সব শেষে হুযুর আনোয়ারের নির্দেশের আলোকে জলসায় অংশগ্রহণকারী হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর অতিথিদের আপ্যায়নের উপর আলোকপাত করেন এবং তাদের প্রতি সম্মানপূর্বক আচরণ করার উপদেশ দেন। এরপর তিনি প্রত্যেক কর্মীকে দোয়ার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যেন আল্লাহ্ তা'ল এই জলসাকে সমস্ত দিক থেকে সাফল্যমণ্ডিত করেন। এরপর দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হয় এর পর তিনি সমস্ত বিভাগগুলির খুঁটিনাটি বিষয় নিরীক্ষণ করেন এবং গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দেন।

২৪ ডিসেম্বর, ২০২১,
জলসার প্রথম দিন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

জলসার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালিত হয় সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান-এর সদর মাননীয় মৌলনা মহম্মদ করীমুদ্দীন শাহিদ সাহেবের সভাপতিত্বে। এরপূর্বে তিনি সকাল দশটায় আহমদীয়াতের পতাকা উত্তোলন করেন এবং দোয়া করেন। তারিক আহমদ লোন সাহেব (কাশ্মীর) তিলাওয়াত করেন। তিনি সূরা আনফাল-এর ২১-২৬ নং আয়াত তেলাওয়াত করেন। এরপর নুরুল ইসলাম বিভাগের নায়েব ইনচার্জ মাননীয় জামাল শরীয়ত সাহেব এর উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন। তিলাওয়াতের পর সদর সাহেব উদ্বোধনী বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, ' হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ১৮৯১ সালে আল্লাহর আদেশে এই জলসার ভিত্তি রচনা করেছিলেন। এই জলসা জাগতিক কোন মেলার মত কখনওই নয়। বরং এর আয়োজনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল ঈমান ও মারেফাতে উন্নতি করা। যেমনটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন- সকল নিষ্ঠাবান এবং বয়আতের অন্তর্ভুক্তদের নিকট প্রকাশ থাকে যে, বয়আতের অর্থ হল, জগতের ভালবাসা যেন প্রশমিত হয় আর দয়ালু প্রভু ও রসুলে মকবুল (সা.)-এর ভালবাসা হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে রাখে।' তিনি এও বলেন যে, এই জলসার একটি অস্থায়ী লাভ এটাও হবে যে, প্রতি বছর যতসংখ্যক নতুন ভাই এই জামাতের অন্তর্ভুক্ত হবে, তারা নির্দিষ্ট দিনে উপস্থিত হয়ে নিজেদের পূর্বের ভাইদের চেহারা দেখতে পাবে।' সদর সাহেব, এটিই সেই ইসলামি ভ্রাতৃত্ব যা এক ও অভিন্ন উম্মত তৈরীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। হুযুর আনোয়ার জলসা সালানা ইউ.কে-তে অংশগ্রহণকারীদের জন্য কিছু ঈমান উদ্দীপক অভিমত বর্ণনা করেছেন। একটি অভিমত এসেছে গিনি কিনাকিরি-র সদর আলহাজ মহম্মদ ওয়াকীল ইয়াতারা সাহেবের পক্ষ থেকে, যিনি ধর্মীয় বিষয়ক পর্যবেক্ষক। তিনি বলেন, জলসার এই তিনটি দিন আমাকে যে জিনিসটি সব থেকে বেশি প্রভাবিত করেছে, সেটি হল আহমদীদের তরবীয়ত করা হয়েছে বিশুদ্ধ ইসলামী শিক্ষায়। আর এখানে যত আহমদী একত্রিত হয়েছে, তাদের দেখে মনে হচ্ছে যেন এরা সকলে ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। একই মায়ের সন্তান এবং সকলে একই পরিবার থেকে এসেছে। অসাধারণ শৃঙ্খলা ও ব্যবস্থাপনা, স্বেচ্ছাসেবীদের সদা হাস্যোজ্জ্বল মুখগুলি, জলসা গাহে কাউকে কোন কষ্ট না দিয়ে যাতায়াত করা- এই সব কিছু দেখে মনে হচ্ছিল এরা যেন কোন স্বর্গীয় সৃষ্টি। আমি উপলব্ধি করছিলাম যেন, আজ যদি কোন জামাত, ইসলামের কাণ্ডারী হতে পারে, তবে তারা হল একমাত্র আহমদীয়া জামাত। তিনি বলেন, বিভিন্ন ইসলামী দেশ ছাড়াও একাধিক বার সৌদি আরব যাওয়ারও সুযোগ হয়েছে, কিন্তু আমি আমার অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বলছি, ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের এমন পরিবেশ আমি কোথাও পাই নি। একথা বলতে আমি মোটেই কুণ্ঠিত নই যে, প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষকে এমনভাবে একত্রিত করা, এরপর অনবরত ইসলামী শিক্ষার প্রচার করা এবং নির্বিবাদে ও নির্বিঘ্নে আল্লাহ্ তা'লার রসুলের ভালবাসায় এই কয়েকটি দিন কাটিয়ে দেওয়া আহমদীয়া জামাতেরই বৈশিষ্ট। ' সব শেষে সদর সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সেই দোয়াটি উপস্থাপন করেন যা তিনি জলসায় অংশগ্রহণকারীদের জন্য করেছিলেন। অতঃপর তিনি নিজের বক্তব্য সমাপ্ত করেন। এরপর মুর্শিদ ডার ও তাঁর সঙ্গীরা সমবেতকণ্ঠে না'তে রসুল পরিবেশন করেন।

জলসার প্রথম বক্তব্য উপস্থাপন করেন মাননীয় ইনআম গৌরী সাহেব, নাযের আলা ও আমীর মাকামী কাদিয়ান। তাঁর বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল 'দেশের সর্বোচ্চ নেতাদের জন্য আঁ হযরত (সা.)-এর আদর্শ।'

এই অধিবেশনের দ্বিতীয় বক্তব্য ছিল 'হযরত ইমাম হাসান (রা.)এবং হযরত মিঞা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)'-এর সম্পর্কে। উপস্থাপন করেন মহম্মদ শরীফ কউসর। বক্তব্যটি ছিল পাকিস্তানের সদর মজলিস আনসারুল্লাহ্ ডক্টর আব্দুল খালিক সাহেবের, যা জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ানের শিক্ষক মহম্মদ শরীফ কউসর সাহেব উপস্থাপন করেন। এরই সাথে উদ্বোধনী অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

২য় অধিবেশন

১ম দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন বেলা ২:৩০টায় আরম্ভ হয়। অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন সদর মজলিস তাহরীকে জাদীদ কাদিয়ান, মাননীয় জালালুদ্দী নাইয়ার সাহেব। মাননীয় মুর্শিদ আহমদ ডার সাহেব তিলাওয়াত করেন সূরা আরাফের ৫৫-৫৯ আয়াত যার অনুবাদ উপস্থাপন করেন মৌলবী সৈয়্যদ কলীমুদ্দীন সাহেব, মরকযী কাযি, দারুলকাযা, কাদিয়ান। এরপর মাননীয় নাসরুম মিনাল্লাহ্ সাহেব, নায়েব নাযের আমুরে আমা নযম পরিবেশন করেন।

এই অধিবেশনের ১ম বক্তব্য উপস্থাপন করেন মাননীয় মৌলনা করীমুদ্দীন সাহেব শাহেদ, সদর সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'দোয়া গৃহীত হওয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ।'

দ্বিতীয় বক্তব্য রাখেন মাননীয় কে তারিক আহমদ সাহেব, সদর মজলিস খুদ্দামুল আহমদীয়া ভারত। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল ,'নতুন প্রজন্মের তরবীয়ত এবং খিলাফতে আহদীয়াত।'

এই বক্তব্যের পর সদর সাহেবের অনুমতিক্রমে অধিবেশনটি সমাপ্ত হয়।

২৫ শে ডিসেম্বর, ২০২১,
দ্বিতীয় দিন, ১ম অধিবেশন

দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশ আরম্ভ হয় বেলা দশটায়। অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন মাননীয় শিরায আহমদ সাহেব, নায়েব নাযিরে আলা, দক্ষিণ ভারত। জনাব ফারুক আযাম সাহেব তিলাওয়াত করেন। তিনি সূরা বাকারার ২৬২-২৬৫ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন এবং এর অনুবাদ উপস্থাপন করেন মাননীয় মহম্মদ নাসার গৌরী সাহেব, নায়েব ইনচার্জ নুরুল ইসলাম। এরপর মাননীয় আব্দুল ওয়াসে সাহেব নযম পরিবেশন করেন।

এই অধিবেশনের প্রথম বক্তব্য রাখেন মাননীয় আতা ইলাহি আহসান গৌরী সাহেব, নাযিম তামিরাত। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনীর একটি দিক- কুরআন সেবার আলোকে কুরআন মজীদের প্রতি তাঁর ভালবাসা ।

দ্বিতীয় বক্তব্য রখেন মৌলানা রফিক আহমদ বেগ সাহেব, নাযির বায়তুল মাল আমাদ। তাঁর বক্তব্যের বিষয়বস্তু ছিল 'আর্থিক কুরবানীর গুরুত্ব।- আঁ হযরত (সা.)-এর সাহাবা ও এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবাদের জীবনীর আলোকে।

তৃতীয় বক্তব্য রাখেন মৌলানা মহম্মদ হামীদ কউসর সাহেব, নাযির দাওয়াতে ইলাল্লাহ্, উত্তর ভারত। তাঁর বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল 'সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.)-এর গৃহীত দোয়াসমূহের ঈমান-উদ্দীপক ঘটনাবলী। '

দ্বিতীয় দিন, দ্বিতীয় অধিবেশন।

দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন সৈয়্যদ তানভীর আহমদ সাহেব, সদর মজলিস ওয়াকফে জাদীদ। তিলাওয়াত করেন জামেয়া আহমদীয়ার ছাত্র মাননীয় উমায়ের আহমদ আব্বাস সাহেব। তিনি সূরা সাফ-এর ৭-১০ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন, যার উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন মাননীয় কমরুল হক খান সাহেব। এরপর জামেয়া আহমদীয়ার ছাত্র মাননীয় মাননীয় রিযওয়ান আহমদ সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রচিত নযম পরিবেশন করেন।

'হামেঁ উস ইয়ার সে তাকওয়া আতা হ্যায়। না ইয়ে হামসে কি আহসানে খোদা হ্যায়। এরপর মৌলনা মুনীর আহমদ খাদিম সাহেব, এডিশিনাল নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ, দক্ষিণ ভারত বক্তব্য রাখেন। তাঁর বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল 'হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে জামাত আহমদীয়ার উন্নতি।

(ক্রমশ.....)

৭ পাতার পর খুতবার শেষাংশ.....

দূরান্তের অঞ্চলগুলোতেও আল্লাহ্ তা'লা এ ধরণের নিষ্ঠাবান লোক দান করে রেখেছেন।

এরপর আযইয়াব আলী মুহাম্মদ আল্ জাবালী সাহেবের স্মৃতিচারণ করব। কিছুদিন পূর্বে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন, اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّاۤ اِلَیۡہِ رٰجِعُوۡنَ-। তিনি জর্ডান জামা'তের সদস্য ছিলেন। জর্ডান জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব লিখেন, তিনি ২০১০ সনে বয়'আত করেছিলেন। নিজের অঞ্চলে একা আহমদী ছিলেন আর সেখানকার রীতিনীতি অনুসারে যেহেতু স্বামীর সাথে তার স্ত্রীও তার ধর্মের অনুসারী হয়ে যায় তাই তিনিও আহমদী হয়ে যান। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), আহমদীয়াত এবং খিলাফতের প্রতি মরহুমের ঈমান পাহাড়ের মত সু দৃঢ় ছিল। আহমদীয়াত গ্রহণের ফলে পরিবার এবং অন্য বিরোধীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মরহুম দৃঢ়তার এক অনন্য দৃষ্টান্ত ছিলেন। তিনি আহমদীয়াত ও খিলাফতের জন্য গভীর আত্মাভিমান রাখতেন এবং খুবই জোরালোভাবে প্রতিবাদ করতেন। জ্ঞান অর্জন এবং তবলীগ করার তার খু বই আগ্রহ ছিল। অনেক সময় গভীর রাতে ফোন করে বিভিন্ন মসলা-মাসায়েল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতেন। এভাবে তার বাড়িতে বিরোধী এবং আত্মীয়দের সাথে বেশ কয়েকটি তবলীগি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মরহুম বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং এজন্য অনেক বেশি কষ্টে ছিলেন আর এ রোগই আসলে প্রাণঘাতি ছিল। তার কোন কোন আত্মীয় তাকে এই অসুস্থতার সময় বলত, আহমদীয়াতের জন্যই তোমার এ অবস্থা হয়েছে, তুমি আহমদীয়াত ছেড়ে দাও তাহলে আমরা তোমার পক্ষে কিয়ামত দিবসে সাক্ষ্য দিব। এমতাবস্থায় তিনি অত্যন্ত আবেগের সাথে দোয়া করেন যে, হে খোদা! তুমি আমাকে আহমদী মুসলমান অবস্থায়ই মৃত্যু দিও।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হবে অবসরপ্রাপ্ত মুরব্বী জনাব দ্বীন মুহাম্মদ শাহেদ সাহেবের। বর্তমানে তিনি কানাডায় ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ৯২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّاۤ اِلَیۡہِ رٰجِعُوۡنَ-। । তার পরিবারে আহমদীয়াত তার পিতার মাধ্যমে এসেছে, যিনি ১৯৩৮ সনে বয়'আত গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৪০ সনে তার পিতা তাকে সাথে করে কাদিয়ান জলসায় নিয়ে যান, যেখানে তার শ্রদ্ধেয় পিতা কাদিয়ানের শিক্ষা এবং ধর্মীয় পরিবেশ দেখে প্রভাবিত হন আর তারও আগ্রহ ছিল পড়াশোনা করার। এটি দেখে তাকে কাদিয়ানেই এগারো বছর বয়সে হযরত মীর মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব (রা.)'র তত্ত্বাবধানে রেখে আসেন আর সেখানেই তিনি পড়াশোনা করেন। ১৯৫৩ সনে তিনি জামেয়া থেকে শাহেদ ডিগ্রী অর্জন করেন। পাকিস্তানের বিভিন্ন শহরে তিনি মুরব্বী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিন-চার বছর তিনি ফিজি দ্বীপপুঞ্জে মিশনারী ইনচার্জ হিসেবেও দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেয়েছেন। রাবওয়াতে সুদীর্ঘ দিন প্রেস সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালনেরও সৌভাগ্য লাভ করেন। তিনি চারটি পুস্তক রচনা করার পাশাপাশি অসংখ্য জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ রচনা করে গেছেন। তবলীগের উম্মাদনা ছিল তাঁর মাঝে। (এজন্য) তিনি নিত্যনতু ন পন্থা অবলম্বন করতেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও তিনি দু'জন পুত্র এবং তিনজন কন্যা রেখে গেছেন।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ জনাব মিয়াঁ রফিক আহমদ সাহেবের, যিনি জলসা সালানা দপ্তরের একজন কর্মী ছিলেন। সম্প্রতি তিনি ৮৭ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন, اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّاۤ اِلَیۡہِ رٰجِعُوۡنَ-। । তার পিতার নাম ছিল মরহুম বশীর আহমদ সাহেব। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বেই তিনি কাদিয়ান থেকে কোয়েটায় হিজরত করেছেন এবং তার পিতা কোয়েটা জামা'তের আমীর হিসেবে (দায়িত্বপালনের) সৌভাগ্য লাভ করেন। মিয়াঁ রফিক সাহেবের পরিবারে আহমদীয়াতের সূচনা হয় তার পিতামহ, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী হযরত ডাঃ আব্দুল্লাহ্ সাহেবের মাধ্যমে। ১৯৬০ সনে মিয়াঁ রফিক সাহেব লাহোরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত থাকেন, এরপর তাঞ্জানিয়া চলে যান। প্রায় দশ বছর তাঞ্জানিয়ায় অতিবাহিত করেন। এরপর কিছুদিন সেখানে একটি কোম্পানীতে চাকরির পাশাপাশি শিক্ষকতাও করেন। তাঞ্জানিয়াতেও তিনি সেক্রেটারী মাল হিসেবে (জামাতের) সেবা করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৮৬ সনে তিনি ওয়াক্ফে আরযী হিসেবে জলসা সালানা দপ্তরে সেবা করতে আরম্ভ করেন এবং পরবর্তীতে ১৯৮৭ সালে জলসা সালানা দপ্তরের নিয়মিত কর্মী হিসেবে কাজ আরম্ভ করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালে জীবন উৎসর্গ করে রাবওয়ার জলসা সালানা দপ্তরের টেকনিক্যাল বিভাগে টেকনিক্যাল বিষয়াদির নাযেম হিসেবে সেবা আরম্ভ করেন এবং শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত এই দায়িত্বেই বহাল ছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) তাকে বিয়ে করিয়েছিলেন এবং হযরত মওলানা আবুল আতা সাহেব তার বিয়ে পড়িয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তাকে তিনজন পুত্র ও এক কন্যা দান করেছেন।

তার পুত্র বলেন, যদি জামা'তের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে কখনও কোথাও কোন ভুল কথা বলা হতো তবে সাথে সাথে বাধা দিতেন এবং নিষেধ করতেন। খিলাফতের প্রতি তার গভীর ভালোবাসা ছিল। একবার বাড়ির কোন সদস্য বা বাড়িতে আগত কোন অতিথি বলেন, আপনি জামা'তের পক্ষ থেকে যে কোয়ার্টার পেয়েছেন তা খুবই ছোট; আপনি বললে আপনি বড় কোয়ার্টার পেতে পারেন। তিনি বলেন, জামা'ত যদি আমাকে তাঁবুতেও থাকতে দেয় তবে আমি সেখানেই থাকতে প্রস্তুত; আমি কোন দাবি করব না। তার পুত্র আরো লিখেন, বাবার মৃত্যুর পর আমরা তার এই গুণ সম্পর্কে জানতে পেরেছি যে, কিছু দরিদ্র মানুষকে তিনি গোপনে সাহায্য করতেন। তার ছোট ছেলে বলেন, তিনি তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন, কুরআন শরীফের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন, কোমল হৃদয়ের অধিকারী, আন্তরিক ব্যবহার, ঈমানদার, সত্যবাদীতাসহ অসংখ্য উন্নত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। বাবার মাঝে যুগ-খলীফার আনুগত্য এবং খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততা ও ওয়াক্ফের অঙ্গীকার পালনের অসাধারণ স্পৃহা ছিল।

(হুযূর বলেন,) আমিও তার মাঝে এটি দেখেছি, অত্যন্ত ভদ্র মানুষ ছিলেন, পরম বিনয়ের সাথে প্রতিটি কাজ করতেন এবং নিষ্ঠার সাথে নিজের বয়'আতের দায়িত্ব পালনকারী ছিলেন।

অনুরূপভাবে তিনি এ বিষয়েও সচেষ্ট থাকতেন যে, জামা'তের অর্থ কীভাবে সাশ্রয় করা যায় এবং কীভাবে স্বল্পতম ব্যয়ের মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হওয়া যায়। রাবওয়ায় তিনি রুটি বানানোর কিছু মেশিনও ডিজাইন করেন এবং এর জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করেন। তিনি (তার ছোট ছেলে) আরো লিখেন, দুঃখকষ্ট বা দুশ্চিন্তার সময় আমি সর্বদা তার মাঝে ধৈর্য ও দৃঢ় মনোবল প্রত্যক্ষ করেছি। দুঃখকষ্ট বা দুশ্চিন্তার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি তাকে পবিত্র কুরআন পড়তে দেখেছি। অসুস্থতার সময় এবং মৃত্যুর পূর্বেও তিনি বিন্দুমাত্র কষ্টের বহিঃপ্রকাশ করেন নি। প্রতিটি কাজ খুব ঈমানদারী ও আবেগের সাথে করতেন। এটি আগেও উল্লেখ করা হয়েছে।

পরবর্তী স্মৃতিচারণ হল, আমেরিকা জামা'তের সাবেক আমীর এহ্সানুল্লাহ্ জাফর সাহেবের সহধর্মিণী শ্রদ্ধেয়া কানেতা জাফর সাহেবার। সম্প্রতি এক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন, اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّاۤ اِلَیۡہِ رٰجِعُوۡنَ-। ১৯৪১ সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অবসরপ্রাপ্ত সেশন জজ চৌধুরী আযম আলী সাহেব তার পিতা ছিলেন। তারা নানা ছিলেন চৌধুরী ফকীর মুহাম্মদ সাহেব যিনি দেশবিভাগের অব্যবহিত পরে নাযের উমুরে আম্মা হিসেবে দায়িত্ব পালনের সৌ ভাগ্য লাভ করেন। তিনি অজস্র গুণের অধিকারী ছিলেন এবং খুবই প্রসন্ন একজন মহিলা ছিলেন। খিলাফতের সাথে সর্বদা বিশ্বস্ততার সম্পর্ক ছিল আর খুব ভালোভাবে তিনি তা প্রকাশও করেছেন। পবিত্র কুরআনের প্রতি মরহুমার গভীর ভালোবাসা ছিল। মহানবী (সা.) ও হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তার গভীর আন্তরিকতা ছিল। নিজের সন্তানদের মাঝেও (তিনি) এই ভালোবাসা ও আন্তরিকতা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় তিনি মূসী ছিলেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে স্বামী ছাড়াও দু'জন কন্যা রয়েছেন। তার একজন যুবক পুত্র ছিল যিনি কয়েক বছর পূর্বে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেছে। অত্যন্ত ধৈর্যের সাথে তিনি এই কষ্ট সহ্য করেছেন।

অস্ট্রেলিয়ার মুরব্বী এনামুল হক কাওসার সাহেব লিখেন, আমি যখন আমেরিকাতে ছিলাম তখন তিনি অনেক দূর থেকে নিয়মিত কুরআন ক্লাসে অংশ নিতেন। তিনি পিএইচডি ডক্টর ছিলেন কিন্তু খুবই সাদাসিধা মানুষ ছিলেন। তার মধ্যে কোনো ধরণের দাম্ভিকতা বা লোকদেখানো ভাব ছিল না। দরিদ্র ও অভাবীদের প্রতি খুবই যত্নবান ছিলেন। মুবাল্লিগদের প্রতি একজন মমতাময়ী মায়ের মতো আচরণ করতেন এবং তাদের সাথে খুবই সম্মানজনক ব্যবহার করতেন। অত্যন্ত বিনয়ের সাথে সব কাজ করতেন। অধিকাংশ সময় লাজনাদের বলতেন, জুতা রাখার জায়গায় জুতা রাখবেন আর যারা রাখত না (তাদের জুতাগুলো) তিনি নিজে উঠিয়ে রাখার কাজও করতেন। এছাড়া মসজিদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজও অত্যন্ত বিনয়ের সাথে করতেন। তিনি বলেন, তার মাঝে কোন ধরণের দাম্ভিকতা বা লোকদেখানো ভাব ছিল না। খুবই সাদাসিধা পোশাক পড়তেন, উত্তম ব্যবহার করতেন। কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হতেন না। সবার সাথে উত্তম আচরণ করতেন। খিলাফতের পক্ষ থেকে জারিকৃ ত সকল তাহরীকে অংশগ্রহণ করতেন।

আল্লাহ্ তা'লা সকল প্রয়াতের প্রতি ক্ষমাসুলভ আচরণ করুন, তাদের পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তাদের বংশধরদেরকেও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণের তৌফিক দিন।

ও ধর্মপরায়ণ মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না। এ সম্পর্কে হুযুর আনোয়ারের দিক-নির্দেশনা চাই।

হুযুর আনোয়ার বলেন, 'আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে। আর আমি চেষ্টা করে থাকি, ছেলেদেরকেও বোঝাতে থাকি। একথা একেবারে সঠিক যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, তোমরা যখন কাউকে বিয়ে কর, তখন তার গুণাবলী, তার বংশপরিচয়, সৌন্দর্য এবং ধন-সম্পদ দেখে থাক। কিন্তু একজন মোমেনকে সব সময় একজন নারীর ধর্মীয় দিকটি দেখা উচিত। এখন সমস্যা হল, ছেলেদের মধ্যে যদি ধর্মপরায়ণতা না থাকে, তবে তারা মেয়েদের ধর্মপরায়ণতা কিভাবে দেখবে? তাই জামাতী ব্যবস্থাপনা অঙ্গ খুদ্দামুল আহমদীয়াকে আমি বলে থাকি যে, ছেলেদের মাঝে ধর্মপরায়ণা জাগিয়ে তুলুন। ছেলেদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা জাগরিত হলে নিশ্চয় তারা এমন মেয়েদের বিয়ে করার চেষ্টা করবে যারা ধার্মিক। অতএব, এটি হল তরবীয়ত সংক্রান্ত বিষয়। এবিষয়ে আমি জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি আর খুদ্দামুল আহমদীয়া ও আনসারুল্লাহ্ উভয়েরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। কিন্তু লাজনাদের কাজ হল নিজেদেরও চেষ্টা করা, লাজনাদের প্রবীণ সদস্য যারা রয়েছে, যারা মা রয়েছে, তারা যেন ছেলেদের সঠিক শিক্ষা দেয়, তাদের এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় তারা পুণ্যবতী ও ধার্মিক মেয়েদের বিয়ে করবে। মায়েরা যদি নিজেদের ভূমিকা পালন করে তবে অবশ্যই এমন ছেলে তৈরী হবে যারা ধার্মিক মেয়েদেরকে বিয়ে করবে। সমস্যা হল যখন ছেলেদের বিয়ের সময় হয়, তখন মায়েরা বলে ছেলে নিজের ইচ্ছেমত বিয়ে করবে। আর যখন মেয়েদের বিয়ের বয়স পার হতে চলে, তাদের জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসে না, তখন মা-বাবা বলে জামাত এদের বিয়ে দিয়ে দিক। অথচ উচিত ছিল ছেলে ও মেয়ে উভয়কে জামাতের হাতে তুলে দেওয়া এবং ধার্মিক ছেলে বা মেয়ে দেখে বিয়ে দেওয়া যাতে, জামাতের মধ্যেই ছেলে ও মেয়েরা থেকে যায় এবং ভবিষ্যতের জন্য পুণ্যবান ও ধর্মপরায়ণ ছেলে মেয়ে তৈরী হতে থাকে। তাই ছেলে ও মেয়ে, উভয়কে সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করতে হবে। এতে মায়েরাও নিজেদের ভূমিকা পালন করবে আর পিতারাও নিজেদের ভূমিকা পালন করবে। এরজন্য আমি চেষ্টা করি, দোয়াও করি, আর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণও করে থাকি। আল্লাহ্ তা'লা সকলকে এর তৌফিক দিন।

প্রশ্ন: আল্লাহ্ তা'লার নিকট কোন কাজটি সব থেকে প্রিয় আর কোন কাজটি সব থেকে বেশি ঘৃণ্য?

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব অবস্থা অনুসারে আমল হয়ে থাকে। আঁ হযরত (সা.) -এর নিকট এক ব্যক্তি এসে প্রশ্ন করল যে, কোন পুণ্যকর্ম তার অবলম্বন করা উচিত? আঁ হযরত (সা.) তাকে বললেন, তুমি মা-বাবার সেবা কর, এটি আল্লাহ্ তা'লার নিকট পছন্দনীয়। অন্য এক ব্যক্তি এসে প্রশ্ন করল যে, আল্লাহ্ তা'লার নিকট কোন পুণ্যকর্মটি বেশি প্রিয়? আঁ হযরত (সা.) বললেন, তুমি অর্থ-সম্পদ কুরবানী কর। তৃতীয় ব্যক্তি এসে একই প্রশ্ন করলে তিনি বললেন- আল্লাহ্র পথে জিহাদ কর। অনুরূপভাবে চতুর্থ ব্যক্তিকে তিনি অন্য কোন কাজের কথা বলেন।আঁ হযরত (সা.) তাদের কর্মগত অবস্থা সম্পর্কে অবগত ছিলেন। তিনি জানতেন যে, কার মধ্যে কি কি দুর্বলতা রয়েছে। তিনি কিছুটা তাদের সম্পর্কে জানতেন আর কিছুটা আল্লাহ্ তা'লা তাদের বিষয়ে পথপ্রদর্শন করেছেন। অতএব, প্রত্যেকের কর্মগত অবস্থা অনুযায়ী কর্মের নিদান দেওয়া হয়ে থাকে। এটি মানুষের আত্মবিশ্লেষণ করে দেখা দরকার যে, আল্লাহ তা'লা কুরআন মজীদে সাতশ আদেশ দিয়েছেন, সৎকর্মের উপদেশও দিয়েছেন আবার অসৎ কর্ম থেকে বিরত থাকারও নির্দেশ দিয়েছেন। কি কাজ করতে হবে তাও বলে দিয়েছেন। আর কোজ কাজ করতে হবে না সেটিও বলে দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা একটি তালিকা তৈরী করে দিয়েছেন। মানুষের নিজেই যাচাই করে দেখা উচিত যে, তার কি কি দুর্বলতা রয়েছে যা দূর করা উচিত আর কোন পুণ্যকর্মটি সে সম্পাদন করে না কিন্তু করা উচিত। তাই প্রত্যেকে যদি নিজের নিজের অবস্থা বিশ্লেষণ করে দেখে, তবে সংশোধন হয়ে যায়। তাই নিজের কাছ থেকে ফতোয়া নেওয়া উচিত। প্রত্যেকের জন্য ঢালাও ফতোয়া দেওয়া যায় না। নীতিগতভাবে আদেশ রয়েছে যে, নিজেদের দুর্বলতা সন্ধান কর এবং সেগুলিকে দূর করার চেষ্টা কর। আর এর পাশাপাশি পুণ্য কর্মও সম্পাদন কর। এই কারণে আল্লাহ্ তা'লা যে প্রধান নীতি ঘোষণা করে দিয়েছেন তা এই যে তোমাদের কাজ মূলত দুটি। এক আল্লাহ্ ত'লার অধিকার আর দ্বিতীয় হচ্ছে বান্দার অধিকার। যদি আল্লাহ তা'লার ইবাদতের অধিকার সঠিকভাবে পূর্ণ করা হয়, তবে আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে পুণ্য কর্ম করার তৌফিক দেন। দ্বিতীয়ত আল্লাহ তা'লা আদেশ দিয়েছেন তার বান্দার অধিকার প্রদান করতে। মানুষ যখন বান্দার অধিকার প্রদান করার চেষ্টা করবে, তখন সে কারো সঙ্গে অন্যায় করে না, কোন অসৎ কাজ করে না এবং আরও বেশি পুণ্য কর্ম করার তৌফিক লাভ করতে থাকে। এই দুটি বিষয় পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই মূল বিষয় হল দুটি। এক আল্লাহ্র অধিকার আর দ্বিতীয় হল বান্দার অধিকার। মানুষ আরও গভীরে গেলে আত্মসমীক্ষা করতে পারে। নিজের বিবেক দিয়ে বিবেচনা করে দেখুক, নিজেকে প্রশ্ন করুক যে তার মধ্যে কোন কোন দুর্বলতা রয়েছে যেগুলি দূর করা উচিত আর কোন কোন পুণ্যকর্ম তার করা উচিত? এছাড়া একটি হাদীসে এও বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে এসে বলল, 'আমি ততটা পুণ্যবান ব্যক্তি নই। আমার মাঝে বহু দুর্বলতা রয়েছে। আপনি আমাকে এমন একটি অসৎ কর্মের নাম বলে দিন যা আমি ত্যাগ করতে পারি।' আঁ হযরত (সা.) তাকে বললেন, তুমি নিজের কাছে অঙ্গীকার কর যে কখনও মিথ্যা বলবে না। সব সময় সত্য কথা বলবে। যখন সে সব সময় সত্য কথা বলার সংকল্প করল, তখন প্রত্যেক বার সে কোন অসৎ কাজ করতে গেলেই তার মনে হত, আঁ হযরত (সা.) যদি জিজ্ঞাসা করেন যে তুমি অমুক কাজ করেছ, তখন সত্য বললে লজ্জিত হতে হবে। আর মিথ্যা বললে অঙ্গীকার ভঙ্গ হবে। এইভাবে ধীরে ধীরে তার মধ্য থেকে সমস্ত অসৎ গুণগুলি শেষ হয়ে গেল। তাই মানুষের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত। এই কারণেই আল্লাহ্ তা'লা মিথ্যাকে শিরক=তুল্য আখ্যায়িত করেছেন। তাই মানুষের চেষ্টা করা উচিত তুচ্ছ বিষয়েও মিথ্যা থেকে বিরত থাকার। কেননা এটি শিরক-এর সম পর্যায়। আর আল্লাহ্ তা'লার নিকট শিরক অপছন্দনীয়। তাই অনেক বিষয় রয়েছে যে পরিস্থিতি সাপেক্ষে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। অতএব, নিজের দুর্বলতা কি তা নিয়ে আত্মসমীক্ষাকরুন। কিন্তু মূল নীতি এটিই। অর্থাৎ আল্লাহ্র অধিকার এবং বান্দার অধিকার। আর যখন কোন কাজ আরম্ভ কর, তখন একথা মাথায় রেখো যে, আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে দেখছেন। যখন এই বিশ্বাস তৈরী হবে যে আল্লাহ্ আমাকে এবং আমার কাজ দেখছেন, তখন মানুষ অসৎ কর্ম থেকে নিবৃত্ত হবে আর পুণ্যকর্ম সম্পাদনে ব্রতী হবে।

প্রশ্ন: ২০২০ সালের ১৪ই নভেম্বর, বাংলাদেশের লাজনাদের সঙ্গে ভার্চুয়াল সাক্ষাতের সময় সদরলাজনা বলেন, বাংলাদেশের লাজনা ও নাসেরাতদের জন্য হুযুর কোন বার্তা দেন যা এই মিটিংয়ের পর সকলকে পোঁছে দেওয়া হবে। হুযুর আনোয়ার বলেন:

সকলকে আমার পক্ষ থেকে আসসালামো আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বরকাতুহু। তাদেরকে একথাও বলবেন যে, তারা যেন নিজেদের ঈমানে অবিচল থাকে। কঠিন সময় আসে, কষ্ট আসে, কিন্তু এগুলিকে কখনও ধর্মের উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে দিবেন না। প্রতিটি বিপ ও কষ্টের সময় একমাত্র আল্লাহ্র সমীপে নতজানু হবেন, কোন মানুষের কাছে কোনও আশা রাখবেন না। নিজেদের, সন্তানদের এবং পরবর্তী প্রজন্মের তরবীয়তের জন্য অঙ্গীকার করুন যে, তাদেরকে পুণ্যবান ও আদর্শ মোমেন হিসেবে তৈরী করবেন। যদি এই দোয়া করেন আর নিজেদের সন্তানদের জন্য চেষ্টা করেন, তবে অবশ্যই এর জন্য আপনাদেরকে চেষ্টা করতে হবে। তাই নিজেদের সংশোধনের দিকে অনেক বেশি মনোযোগ দিন যাতে, ভবিষ্যতে পুণ্যবান প্রজন্ম তৈরী হতে থাকে। আর সব সময় স্মরণ রাখবেন যে, যদি আমাদের মেয়েদের সংশোধন হয়ে যায়, তারা সৎকর্মশীল হয়ে যায়, তবে আমাদের মেয়েরা তাকওয়ার উচ্চ মান অর্জন করতে শুরু করবে। আর তখন আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম নিরাপদ হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ্॥ তখন আমাদের আর কোন চিন্তা থাকবে না। এটিই লাজনা ইমাউল্লাহ্র কাজ। আর সমস্ত লাজনা ও নাসেরাতদের ভাবী মায়েদের জন্য এটিই আমার বার্তা

প্রশ্ন: হুযূর, আমার প্রশ্ন হল,

বিশ্বব্যাপী নতুন যারা আহমদী হচ্ছেন তাদের জন্য আপনার নির্দেশনা কী?

হুযূর (আই.) বলেন: তুমি সুন্নি মুসলমান থেকে আহমদী হয়েছ?

প্রশ্নকারী: জ্বী। হুযূর (আই.): তাহলে তুমি ইতিমধ্যে ঈমানের বিষয়ে অবগত হয়েছ। ইসলামের ৫টি রুকন সম্পর্কেও তুমি অবগত। এছাড়া তুমি জানো যে, পবিত্র কুরআন মহানবী (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে। কুরআনই সর্বশেষ শরিয়তবাহী কিতাব। মহানবী (সা.) খাতামান্নাবিঈন এবং নবীগণের মোহর আর তিনিই (সা.) সর্বশেষ শরিয়তবাহী নবী- সে সম্পর্কেও তুমি অবগত। অতএব, একজন আহমদী ও অ-আহমদীর মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হল, তোমরা বিশ্বাস করো যে, যুগের মসীহ্ যার আগমনের কথা ছিল এবং মহানবী (সা.) যার আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তিনি এসে গেছেন আর তোমরা তাকে মান্য করেছ। তোমরা আগে থেকেই আমাদের মত একই নবী, একই কিতাব এবং একই ধর্মে বিশ্বাস করো। অতএব, তোমরা কেন মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মান্য করেছ? কারণ তোমরা জানো যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্র আগমন সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে। আর তোমরা মহানবী (সা.)-এর এই আদেশ পালন করেছ অর্থাৎ 'যখনই ইমাম মাহদী আসবে, তোমরা তার হাতে বয়আত করবে'- এই আদেশ পালন করেছ। যেহেতু তুমি আহমদীয়াত গ্রহণ করেছ তাই তোমার জীবনধারায় এবং তোমার ধর্মীয় আচারে কিছু পরিবর্তন আসতে হবে। মানুষ জানবে যে, আহমদীয়াত গ্রহণের পর তোমার জীবনে পরিবর্তন এসেছে। এখন তুমি পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করো। সম্ভব হলে বাজামা'ত নামায আদায় করো। যদি সম্ভব না হয় তাহলে তুমি বাড়িতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায বাজামা'ত আদায় করো। কুরআন নিয়মিত পাঠ করো এবং কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্ তা'লার আদেশ নিষেধ পালন করার চেষ্টা করো। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের যে কাজ করতে আদেশ দেন সেগুলো আমাদের করা উচিত। (ক্রমশ...)

আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং কুরআন মজীদের রক্ষক

-মৌলানা মহম্মদ হামীদ কওসার, নাযির দাওয়াতে ইলাল্লাহ্, দক্ষিণ ভারত

(৪র্থ পর্ব)

৪র্থ আপত্তি।

হযরত উসমান কুরআনের নামে তৈরী করা অন্যান্য অনুলিপিগুলি পুড়িয়ে ফেলার আদেশ দিয়েছিলেন?

উত্তর: ইসলামের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, সাহাবাগণ কুরআন করীম নাযেল হওয়ার প্রারম্ভিককাল থেকেই ব্যক্তিগতভাবে কুরআন করীম লিখতে থাকতেন। এর প্রমাণ হল হযরত উমর (রা.) নবুয়্যতের দাবির ৫ম কিম্বা ৬ষ্ঠ বছর ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পূর্বে ৪০ জন পুরুষ ও ১১ জন মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ সেই সময় মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ৫১জন।

(মিশকাত, আসমাউর রিজাল)

হযরত উমর (রা.) তাঁর বাড়ি থেকে হুযুর(সা.) কে হত্যার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। পথিমধ্যে কেউ তাঁকে বললেন, আপনার বোন ফাতেমা এবং ভগ্নীপতি মুসলমান হয়ে গিয়েছে। হযরত উমর বোনের বাড়ি গিয়ে পৌছলে তাঁর বোনে কুরআনের পৃষ্ঠাগুলো লুকিয়ে দেন। হযরত উমর বোনকে বলেন: وَقَالَ لِأُخْتِهِ اَعْطِيْنِيْ هٰذِهِ الصَّحِيْفَةَ (সীরাত ইবনে হিশাম, বাব ইসলাম উমর বিন খাত্তাব, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪১)

সুধী পাঠকবর্গ! লক্ষণীয় বিষয় হল কুরআন করীম নাযেল হওয়া তখন মাত্র পাঁচ বা ছয় বছর হয়েছিল, সেই সময় পর্যন্ত নাযেল হওয়া কুরআন পৃষ্ঠাকারে হযরত উমরের বোন ফাতেমার নিকট মজুদ ছিল।এর থেকে অনুমান করা যায় যে কুরআন করীমের নামে অনেক অনুলিপি সাহাবারা নিজেদের কাছে লিখে রেখেছিল।

হযরত উসমরন তাঁর খেলাফতকালে উপলব্ধি করেন যে, সেটিই প্রকৃকত কুরআন হবে যেটি সনদ মোতাবেক হবে। বাকি বাদ দেওয়া হবে।

ঐশী সংরক্ষণের অকাট্য প্রমাণ:

১) কুরআন মজীদের প্রকৃত সংরক্ষক স্বয়ং আল্লাহ্ হযরত আবু বাকার ও হযরত উসমান (রা.)-এর মাধ্যমে আসল নির্ভরযোগ্য কুরআনকে একত্রিত করার কাজ করেন যেগুলি পৃষ্ঠাকারে ছিল।

২)আল্লাহ্ তা'লা যদি এমনটি না করাতেন, তবে কুরআন করীম হাদীসের তুল্য হয়ে পড়ত। আর যেভাবে কিছু কিছু হাদীসে সংঘাত রয়েছে, তেমনভাবে কুরআন করীমের আয়াত সম্পর্কেও সাহাবাদের মতামত ভিন্ন ভিন্ন হত। আর প্রত্যেক সাহাবী বলতেন যে তার কাছে যে কপিটি রয়েছে তাতে অন্য কিছু লেখা আছে। কেননা প্রত্যেক সাহাবা ভুল করতে পারে। বাক্য বুঝে লেখার কাজ প্রত্যেক মানুষের নয়। তাই এমন লিখিত কুরআন কলীমে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকত। হযরত উসমান এই সকল সম্ভাবনাকে মিটিয়ে দিয়েছেন এবং সেগুলিকে পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন আর এগুলি সবই হ্ছিল খোদার অদৃশ্য হাত দ্বারা।

৩) কুরআনের নামে অপ্রত্যায়িত সেই সব অনুলিপিগুলিকে যদি না পুড়িয়ে ফেলা হত তবে আশঙ্কা ছিল মুনাফিক ও ইসলামের শত্রু ইহুদী ও নাসারারা স্বরচিত বাক্য এনে কুরআনের কোনও অনুলিপির মধ্যে মিশিয়ে দিত আর সেগুলিকেও কুরআন বলে দাবি করত। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বলেন- "অথচ তাহাদের মধ্যে একদল এমন আছে, যাহারা আল্লাহ্র কালাম শুনে এবং উহা বুঝিবার পরও উহাকে বিকৃত করিয়া দেয়, অথচ তাহারা (উহার মন্দ পরিণাম সম্পর্কে) সবিশেষ অবগত আছে। (আল বাকারা: ৭৬)

অতঃপর অন্যত্র বলেন: সুতরাং পরিতাপ তাহাদের জন্য যাহারা স্বহস্তে কিতাব লিখে, অতঃপর তাহারা বলে,'ইহা আল্লাহ্র নিকট হইতে।'

(আল বাকারা: ৭৬)

ইহুদীদের একটি দলের অভ্যাস ছিল কুরআন মজীদের বাক্যগুলি বিকৃত করে পড়া যাতে এর অর্থ বিকৃত হয়। এই জন্যই কুরআন করীমে আল্লাহ্ তা'লা মোমেনরেকে আদেশ দিয়েছেন (সূরা বাকারা: ১০৫) অর্থাৎ 'তোমরা (নবীকে) 'রায়েনা' বলিও না, বরং 'উনযুরনা' বলিও ।

ব্যাখ্যা পুস্তকে লেখা আছে যে, ইহুদীরা 'রায়েনা' -কে 'রাঈনা' (আমাদের মেষ বালক) উচ্চারণ করত।

হযরত উম্মুল মোমেনীন (রা.)) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) -এর নিকট কতিপয় ইহুদী এসে আসসালামো আলাইকুম-এর পরিবর্তে 'আসসামু আলাইকা' (অভিশাপ) দিত। (সহী মুসলিম, কিতাবুস সালাম)

বিরোধীরা আঁ হযরত (সা.)-এর জীবদ্দশাতে এই শব্দগুলির বিকৃতি ঘটাত। যদি ঐশী প্রতিশ্রুতি এবং যথাসময়ে হযরত আবু বাকার ও হযরত উসমান (রা.)-এর পক্ষ থেকে পদক্ষেপ গৃহিত না হত, তবে কুরআন করীমের বিরুদ্ধে আর কি কি ষড়যন্ত্র রচিত হত তা বলাই বাহুল্য।

তওরাতে বিকৃতির উদাহরণ:

ইহুদী ও নাসারা তওরাতের মধ্যে কিভাবে রদবদল ঘটিয়েছিল তার কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নরূপ।

১) তওরাত সম্পর্কে এই বিশ্বাস প্রচলিত যে সেটি হযরত মূসা (আ.)-এর উপর নাযেল হয়েছিল। যে গ্রন্থ মূসার উপর নাযেল হয়েছিল, তার মধ্যে এই সংযোজন করা হয়েছিল- 'অতএব,খোদা ওয়ান্দের বান্দা খোদাওয়ান্দের উক্তি অনুসারে সেখানে মোয়াব দেশে মৃত্যু বরণ করেছে। ..... এবং মূসা তাঁর মৃত্যুর সময় একশ কুড়ি বছর বয়সের ছিলেন।"

(দ্বিতীয় অধ্যায়, বাব-৩৪, আয়াত:৭)

উপরোক্ত বাক্য বলে দিচ্ছে যে এটি মূসা (আ.)এর মৃত্যুর পর সংযোজিত হয়েছে। অন্যথায় হযরত মূসা (আ.)-এর মৃত্যুর পর তিনি কিভাবে বলতেন যে তার বয়স ১২০ বছর ছিল।

ইসলামের বিরুদ্ধবাদীদের চেষ্টা ছিল কুরআন করীমকেও বিকৃত করার। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা প্রদত্ত শক্তি অনুসারে হযরত আবু বাকার ও হযরত উসমান (রা.)এর সাহসিক ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ কুরআন করীমকে যাবতীয় সংযোজন থেকে রক্ষা করেছে। আলহামদো লিল্লাহ।

অতএব, আল্লাহ্ তা'লা এমন মহান নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, তিনি প্রত্যেক যুগে কুরআন করীমকে আক্ষরিক অর্থেও রক্ষা করবেন এবং অর্থ সংক্রান্ত ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক দিকটিও অক্ষুন্ন রাখতে স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে থাকবেন। ইনশাআল্লাহ॥

৫নং আপত্তি।

আরও একটি আপত্তি করা হয় যে হযরত আলি (রা.)কুরআন মজীদের সংশোধন করেছেন।

উত্তর: এটি আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী। আল্লাহ্ তা'লা কখনওই এমনটি হতে দেন নি। এটি হযরত আলির প্রতি অন্যায় আরোপ করার নামান্তর। এটি যদি সত্যি হত, তবে আপত্তিকারীরা এই প্রশ্নগুলির উত্তর দিক-

১) তাদের মতে হযরত আলি (রা.) কুরআন করীম সংশোধন করেছেন। তবে শিয়া শাসিত দেশগুলিতে সেখানে তারা হযরত আলি (রা.)-এর দ্বারা সংশোধনকৃত কুরআন প্রকাশ করে না কেন? বরং দেখা যায় যে ইরান ও অন্যান্য শিয়া প্রতিষ্ঠান সেই কুরআনই প্রকাশ করে থাকে, পাঠ করে এবং পড়ায় যা সুন্নী জামাতগুলির কাছে রয়েছে।

২) হযরত আলি ইসলামের চতুর্থ খলীফা ছিলেন। তিনি তাঁর নিজের খিলাফতকালে সেই সংশোধনকৃত কুরআন প্রবর্তন করেন নি কেন? এবং তিনি মুসলমানদেরকে কেন একথা বলেন নি যে, তোমাদের স্মৃতিতে যে কুরআন রয়েছে, সেগুলি মুছে দিয়ে এই নতুন সংশোধিত কুরআন মুখস্ত করে নাও। এমন কোন রেওয়াতে ইসলামের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। অতএব এই আপত্তিটি অত্যন্ত দুর্বল এবং প্রত্যাখ্যান যোগ্য। বাস্তবের সঙ্গে এর কোন রকম যোগসূত্র নেই। বস্তুত আল্লাহ্ তা'লা নিজেই কুরআন করীমের রক্ষক, তিনি স্বয়ং কুরআন করীমকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এবং এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি কুরআনকে যাবতীয় বিকৃতি ও সংযোজন থেকে রক্ষা করেছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত রক্ষা করবেন। ইনশাআল্লাহ॥

৬নং আপত্তি: কুরআন করীমের অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা নিয়ে মুসলমানদের মধ্যেই মতবিরোধ রয়েছে। এবং ভুল ব্যাখ্যার সুযোগ নিচ্ছে সুযোগ সন্ধানী ও সন্ত্রাসীরা যারা মানবতার জন্য বিপদ।

উত্তর: আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বলেন: আমরা কুরআন মজীদনকে বাগ্মী ও সাবলীল আরবী ভাষায় অবতীর্ণ করেছি। আর এটিই আল্লাহ্ তা'লার বাণী।

আর যতদূর এ সম্পর্কে বলা যায় যে এর ভুল ব্যাখ্যাকে স্বার্থান্বেষী এবং সন্ত্রাসীরা কাজে লাগাচ্ছে, এখানে দোষ সন্ত্রাসী ও সেই সব সুযোগ সন্ধানীদের, কুরআন করীমের কোন দোষ নেই। কেউ যদি দেশের আইন এবং নিয়মের কোন অনুচ্ছেদের ভুল ব্যাখ্যা করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, তবে এতে আইনের কোন দোষ নেই, দোষ হল বিভান্তিসৃষ্টিকারীর।

আপত্তিকারীর মত কেউ যদি এই দাবি করে যে এই নিয়ম ও আইন বিলোপ করা হোক, কেননা এর দ্বারা অনেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে, তবে কি এমন ব্যক্তির দাবি মেনে নেওয়া হবে? কখনই নয়।

এটিকে অন্য একটি উদাহরণের মাধ্যমেও বোঝা যেতে পারে। যেমন- যদি কোন নির্বোধ ও অজ্ঞ মুসলমান একথা বলে যে, কুরআন করীমে স্পষ্ট লেখা আছে যে , 'লা-তাকরাবুস সালাত'। (সূরা নিসা: ৪৪) এবং অন্যত্র লেখা আছে - 'ফা অউলুল্লিল মুসাল্লীন' (মাউন: ৫) অর্থাৎ নামাযের নিকট যেও না। যে যাবে, সে ধ্বংস হবে। তাই মুসলমানদের নামায পড়া উচিত নয়। এখন যদি কোন নির্বোধ এসে দাবি করে যে, কুরআন করীমের এই দুটি আয়াত (আল্লাহ্ না করুক) বিলোপ করা হোক। কেননা এর দ্বারা মুসলমানদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরী হচ্ছে। তবে কি এই দাবি সঠিক হিসেবে বিবেচিত হবে।

(ক্রমশ.....)

জুমআর খুতবা

খোদার কসম! তুমি আমার নিকট আল্লাহ্‌র ভূমির মধ্যে সব থেকে বেশি প্রিয় এবং আল্লাহ্‌র ভূমির মধ্য থেকে আল্লাহ্‌র নিকটও তুমি সব থেকে বেশি প্রিয়। যদি তোমার বাসিন্দারা আমাকে জোর করে বের না করত, আমি কখনও বের হতাম না।

আঁ হযরত (সা.) বললেন, আবু বাকার! আমি হিজরত করার অনুমতি পেয়ে গিয়েছি।

হযরত আবু বাকার অবলীলায় বলে উঠলেন, 'আমিও সঙ্গে থাকব? ' আঁ হযরত (সা.) বললেন, 'হ্যাঁ।'

আঁ হযরত (সা.)–এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ সিদ্দীকে আকবার হযরত আবু বাকার সিদ্দীক (রা.)–এর পবিত্র জীবনালেখ্য।

সৈয়্যদনা আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের টিলফোর্ড স্থিত মসজিদে **মুবারকে প্রদত্ত** ২৪ শে ডিসেম্বর, ২০২১, **এর জুমুআর খুতবা (২৪ ফাতাহ, ১৪০০ হিজরী শামসী)**

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্‌হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে। আকাবার দ্বিতীয় বয়'আত সম্পর্কে লেখা আছে যে, আকাবার দ্বিতীয় বয়'আতের সময় মহানবী (সা.)–এর সঙ্গে ছিলেন হযরত আবু বকর (রা.), হযরত আলী (রা.) এবং মহানবী (সা.)–এর চাচা হযরত আব্বাস (রা.)। বলা যায় হযরত আব্বাস (রা.) ছিলেন এই অনুষ্ঠান বা সভার প্রধান ব্যবস্থাপক। তিনি হযরত আলী (রা.)–কে একটি উপত্যকায় পাহারাদার হিসেবে দাঁড় করান এবং আরেকটি উপত্যকায় হযরত আবু বকর (রা.)–কে তিনি প্রহরা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব পালনের জন্য দাঁড় করিয়েছিলেন।

(আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ২১)

যখন মহানবী (সা.)–এর মদীনায় হিজরত হয় তখন তাতে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র সঙ্গী হওয়ার উল্লেখ রয়েছে। লেখা আছে, মক্কায় বসবাসরত মুসলমানদের ওপর মক্কার কাফিরদের নিপীড়ন ও নির্যাতন ক্রমাগত বেড়েই চলছিল। সে সময় মহানবী (সা.)–কে একটি স্বপ্ন দেখানো হয়, যাতে দু 'জন মুসলমানকে সেই জায়গা দেখানো হয় যেখানে তাঁর হিজরত হবার ছিল। সেটি খেজুর বাগানে পরিবেষ্টিত একটি লোনা ভূমি ছিল। কিন্তু এই (জায়গার) নাম দেখানো হয় নি এবং বলাও হয় নি। যাহোক, এর ভৌগলিক অবস্থান ও নকশার ধারণা করে মহানবী (সা.) স্বয়ং ব্যাখ্যা করে বলেন, হাজর বা ইয়ামামা হবে। যেমনটি সহীহ্ বুখারীর একটি হাদীসে উল্লেখ পাওয়া যায়– সে অনুসারে তিনি (সা.) বলেন,

فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوِ الْهَجَرُ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ ।

(সহী বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস–৩৬২২)

অর্থাৎ,আমার ধারণা হল, সেই স্থানটি হবে ইয়ামামা কিংবা হাজর। কিন্তু পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় যে, সেটি ইয়াসরেব বা মদীনা। ইয়েমেনের একটি প্রসিদ্ধ শহরের নাম ইয়ামামা। (ফারহাঙ্গো সীরাত, পৃ: ৩২১, যোওয়ার একাডেমি পাবলিকেশন, উর্দু বাজার, করাচি, ২০০৩)

আর আরব ভূ –খণ্ডের বিভিন্ন অংশে হাজর নামের শহর পাওয়া যেত। বাহরাইনের একটি অংশকেও হাজর বলা হতো।

(মুজামুল বালদান , ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৫২)

যাহোক, কিছুদিন পরেই পরিস্থিতি একটি দিকে মোড় নিতে থাকে আর মদীনার সৌভাগ্যবান ও পুণ্যবান আনসার সদস্যরা ইসলাম গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। তখন ঐশী এলকা বা ঐশী প্রেরণায় তাঁর সামনে সুস্পষ্ট হয় যে, সেই অঞ্চলটি তো ছিল ইয়াসরেব অঞ্চল যা পরবর্তীতে মদীনা নামে প্রসিদ্ধ হওয়ার ছিল।

মহানবী (সা.)–এর এই এজতেহাদ বা ব্যাখ্যার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "যে হাদীসে فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوِ الْهَجَرُ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ يَثْرِبُ বাক্য রয়েছে তা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করছে যে, মহানবী (সা.) নিজ ব্যাখ্যায় ভবিষ্যদ্বাণীর (পূর্ণতার) জায়গা ও সত্যায়নস্থল বলতে যা কিছু ধরে নিয়েছিলেন তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে।"

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ:৪৭২)

অতএব, মহানবী (সা.) মক্কার নির্যাতিত ও নিপীড়িত সাহাবী এবং মুসলমানদের মদীনা অভিমুখে হিজরত করার জন্য অনুমতি ও নির্দেশনা প্রদান করেন। এর ফলে মক্কার মুসলমানরা মদীনার উদ্দেশ্যে হিজরত করতে আরম্ভ করেন। অপরদিকে আকাবার দ্বিতীয় বয়'আতের পর এই হিজরতেও গতি সঞ্চারিত হয়। ফলে বাড়ির পর বাড়ি এবং পাড়ার পর পাড়া খালি হয়ে যেতে থাকে। এই অবস্থা মক্কার অত্যাচারী নেতাদের আরো উত্তেজিত করে আর তারা রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যায়। তখন তারা আরো একটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে, অর্থাৎ এই নির্যাতিতদের হিজরত করতেও বাধা দিতে আরম্ভ করে আর অত্যাচার ও নিপীড়নের নিত্যনতুন উপায় বের করতে থাকে।

কখনও স্বামীকে যেতে দেওয়া হলেও তার স্ত্রী–সন্তানদের তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়। আবার কখনও কারও মূলধন বা সম্পদ এই অজুহাতে হাতিয়ে নেওয়া হতো যে, তুমি এই (সম্পদ) আমাদের শহর মক্কায় উপার্জন করেছ, তাই এখান থেকে যেতে হলে পুরো সহায়–সম্পদ আমাদের দিয়ে যাও। কখনও বা মায়ের মমতার দোহাই দিয়ে বাধা দিয়েছে। অর্থাৎ তোমার মায়ের সাথে সাক্ষাৎ করে যাও আর এরপর পথিমধ্যেই তাকে রশি দিয়ে বেঁধে গৃহবন্দী করে রাখা হতো।

(সুবালুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২২৪–২২৭)

কিন্তু ঈমানের সম্পদে সম্পদশালী, ইসলাম ধর্মের ভালোবাসায় বিভোর এবং ধৈর্যধারণকারী ও কৃতজ্ঞ মু'মিনদের দল পাগলপারা হয়ে একের পর এক মদীনায় হিজরত করতে থাকে। যাহোক, মক্কা যখন এমন সব মুসলমান থেকে প্রায় শূন্য হয়ে যায়, যাদের জন্য হিজরত করা সম্ভব ছিল তারা যখন হিজরত করে তখন অল্প কিছু চরম দুর্বল ও অসহায় মুসলমানই পিছনে রয়ে গিয়েছিল যাদের উল্লেখ পবিত্র কুরআন এভাবে করেছে–

الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا

অর্থাৎ, কেবল সেসব নরনারী ও শিশু ছাড়া যাদের দুর্বল বানিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং যাদের কোন উপায় ছিল না আর তারা বের হওয়ার কোন পথও খুঁজে পাচ্ছিল না। (সূরা আন্ নিসা: ৯৯)

এদের ছাড়াও মহানবী (সা.) তখনও খোদার অনুমতির অপেক্ষায় মক্কায় অবস্থান করছিলেন। হযরত আলী (রা.)ও মক্কাতেই ছিলেন। অবশ্য হযরত আবু বকর (রা.) হিজরতের অনুমতি নেয়ার জন্য মহানবী (সা.)–এর সমীপে উপস্থিত হলে তঁাকে বলা হয়, অপেক্ষা করুন; আশা করছি আমাকেও অনুমতি দেওয়া হবে। অথবা আরেকটি রেওয়ায়েত অনুসারে তিনি (সা.) বলেন, আপনি তাড়াহুড়ো করবেন না, হতে পারে আল্লাহ্ তা'লা আপনার জন্য একজন সঙ্গীর ব্যবস্থা করে দিবেন।

একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার পিতামাতা আপনার জন্য নিবেদিত, আপনিও কি হিজরতের অনুমতি পেয়ে যাবেন? (মনে হচ্ছিল) যেন মহানবী (সা.)–এর হিজরতের কারণে {আবু বকর (রা.)'র} বিচ্ছেদ–বেদনা দূরীভূত হতে থাকে। হযরত আবু বকর (রা.) খুশির এই সুসংবাদ শুনে ফিরে আসেন এবং হিজরতের ইচ্ছা স্থগিত করেন। অবশ্য তিনি বুদ্ধিকরে দু'টি উটনী ক্রয় করেন, যেগুলোকে ভালোভাবে খাইয়ে–দাইয়ে হিজরতের অজানা সফরের জন্য প্রস্তুত করতে থাকেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল কাফালাহ, হাদীস–২২৯৭) (আল খলীফাতুল আওয়াল আবু বাকার সিদ্দীক, প্রণেতা –সালাবী, পৃ: ৪৫)

এসব কথার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "মহানবী (সা.) এবং তাঁর সঙ্গী–সাথীরা হিজরতের প্রস্তুতি নিতে শুরু করেন।

পরিবারগুলো একের পর এক মক্কা থেকে উধাও হতে থ াকে। সেসব লোক যারা ঐশীরাজত্বের অপেক্ষায় ছিল তারা সাহসি হয়ে উঠে। অনেক সময় একই রাতে মক্কার কোন একটি পুরো গলির সবক'টি বাড়িতে তালা লেগে যেত আর সকালবেলা যখন শহরবাসীরা পুরো গলি নীরব ও নিস্তব্ধ দেখতে পেত তখন জিজ্ঞেস করে অবগত হতো, এই গলির সকল বাসিন্দা মদীনায় হিজরত করেছে। ইসলামের এমন গভীর প্রভাব দেখে যা ভেতরে ভেতরে মক্কার লোকদের মাঝে ছড়িয়ে পড়ছিল, তারা বিস্মিত হয়ে যাচ্ছিল। পরিশেষে মক্কা মুসলমান শূন্য হয়ে যায়। শুধু কিছু সংখ্যক ক্রীতদাস, মহানবী (সা.) নিজে এবং হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত আলী (রা.) মক্কায় রয়ে যান।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২২২)

পুনরায় তিনি (রা.) বলেন, মক্কার কাফিররা স্বভাবতই অন্য লোকদের তুলনায় মহানবী (সা.)-এর প্রতি বেশি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করত। কেননা তারা দেখত যে, মহানবী (সা.)-এর শিক্ষার ফলেই মানুষের মাঝে শির্ক-এর বিরোধিতা ছড়িয়ে পড়েছে। তারা জানত, তারা যদি তাঁকে হত্যা করতে পারে তাহলে অবশিষ্ট জামা'ত এমনিতেই শৃংখলা হারিয়ে ফেলবে। তাই তারা অন্যদের তুলনায় মহানবী (সা.)-কে বেশি কষ্ট দিত আর তারা চাইত তিনি (সা.) যেন কোনভাবে তঁ ার দাবি থেকে বিরত হয়ে যান। এসব সমস্যার কারণে তিনি (সা.) সাহাবীদেরকে হিজরতের অনুমতি দিয়ে দেন কিন্তু এসব দুঃখকষ্ট সত্ত্বেও তিনি (সা.) মক্কা থেকে হিজরত করেন নি। কেননা খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তিনি অনুমতিপ্রাপ্ত হন নি। যেমন হযরত আবু বকর (রা.) যখন জিজ্ঞেস করেন, আমি (কি) হিজরত করব? তখন তিনি (সা.) উত্তরে বলেন, عَلٰى رِسْلِكَ فَإِنِّيْ أَرْجُوْ أَنْ يُّؤْذَنَ لِيْ অর্থাৎ, আপনি অপেক্ষা করুন, আশা করি আমাকেও অনুমতি দেওয়া হবে।"

[সীরাতুন নবী (সা.), আনোয়ারুল উলুম, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৮৯]

দ্বারুন্ নাদওয়াতে কাফিররা মহানবী (সা.)-এর বিরুদ্ধে গোপন শলাপরামর্শের জন্য সমবেত হয়।

এ সম্পর্কে লিখা রয়েছে, মক্কার নেতৃবৃন্দ এ বিষয়ে ভীষণ ক্ষেপাটে ছিল এবং ক্ষোভে ফুঁসছিল এ কারণে যে, মুসলমানরা তাদের হাত ফস্কেবেরিয়ে গেছে। এ প্রেক্ষিতে তারা দ্বারুন্ নাদওয়াতে একত্রিত হয়। আল্লামা ইবনে ইসহাক বলেন, কুরাইশরা যখন দেখে, মহানবী (সা.)-এর সাথে কিছু লোকের একটি দল যোগ দিয়েছে যারা মক্কার মুসলমান না আর তাদের অঞ্চলেরও না। অধিকন্তু কুরাইশরা দেখে, মহানবী (সা.)-এর সাহাবীরা হিজরত করে তাদের কাছে চলে যাচ্ছে। কুরাইশরা বুঝতে পারে,তারা একটি নিরাপদ জায়গায় আশ্রয় নিচ্ছে আর তারা তাদের, অর্থাৎ মদীনাবাসীর পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করেছে। কাজেই, তাদের শঙ্কা হয় পাছে কোথাও আবার মহানবী (সা.) হিজরত করে তাদের কাছে চলে যান। কুরাইশরা বুঝে যায় যে, কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে তারা সমবেত হচ্ছে। অতএব, তাঁর বিরুদ্ধে পরিকল্পনার জন্য তারা দ্বারুন্ নাদওয়ায় একত্রিত হয়। এটি কুসাই বিন কিলাবের সেই বাড়ি যেখানে কুরাইশদের সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো। যখনই তারা তাঁর বিষয়ে শঙ্কিত হত তখন তারা পরামর্শের জন্য এখানে আসতো। অপর একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) সম্পর্কে পরামর্শ করার জন্য তারা দারুন্ নাদওয়ায় প্রবেশ করার বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। যে দিনের বিষয়ে তারা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয় সেদিন তারা যায় আর সেদিনকে ইয়াওমুয্ যাহ্মা বলা হয়।তাদের সামনে এক বয়ঃবৃদ্ধ ব্যক্তির বেশে এক ইবলিসের আবির্ভাব ঘটে। এর অর্থ হল, সে এমন মানুষ ছিল যে ইবলিসী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল। সে চাদর মুড়ি দিয়ে দারুন্ নাদওয়ার দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। লোকেরা তাকে চিনত না। তাকে দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তারা জিজ্ঞেস করে এই বৃদ্ধ লোকটি কে? সেই ব্যক্তি উত্তরে বলে, আমি নাজাদ নিবাসী এক বৃদ্ধ মানুষ। সে আরও বলে, আমি তোমাদের সেই কথা শুনেছি যে বিষয়ে তোমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছ। অতএব, তোমরা কী বল তা শোনার জন্য আমি এখানে এসেছি। সে নিজের সম্পর্কে বলে আশা করি এ থেকে তোমরা কল্যাণকর কিছু পেয়ে যাবে। তারা বলে, ঠিক আছে ভেতরে আসুন। সে তাদের সাথে ভেতরে প্রবেশ করে। সেখানে কুরাইশের নেতৃস্থানীয়দের একটি বড় দল উপস্থিত ছিল যাদের মাঝে উল্লেখযোগ্যরা হচ্ছে, উতবা বিন রবিয়্যা, শেয়বা বিন রবিয়্যা, আবু সুফিয়ান বিন হারব, তায়েম্মা বিন আদী, আবু জাহল বিন হিশাম, হাজ্জাজের দুই ছেলে ছাড়াও আরও অনেক মানুষ ছিল। এছাড়াও এমন কয়েকজন নেতা ছিল যারা কুরাইশ ছিল না। সবাই যখন একত্রিত হয় এবং পরামর্শ দেয়ার সময় আসে তখন একজন পরামর্শ দেয় তাঁকে, অর্থাৎ মুহাম্মদ (সা.)-কে লোহার শিকলাবদ্ধ করে বন্দী করে রাখ আর বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দাও। এরপর তঁ ার জন্য সেই মৃত্যুর অপেক্ষা কর যা ইতোপূর্বে তঁ ার মত দু 'জন কবির ওপর আপতিত হয়েছে। যেমন- যোহায়ের ও নাবগাহ্ এবং আরো অন্যান্য কবি যারা ইতোপূর্বে গত হয়েছে। অর্থাৎ, পরিণতির অপেক্ষায় থাক, যেভাবে ইতোপূর্বে দু 'জন কবি যোহায়ের ও নাবেগাহ্'র ক্ষেত্রে ঘটেছে, অর্থাৎ মৃত্যু তঁ াকে ধ্বংস করা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। যেভাবে তাদের মৃত্যু হয়েছিল সেভাবে মহানবী (সা.)-এর জন্যও একই পরিকল্পনা করা হয়। একথা শুনে সেই নাজাদবাসী বৃদ্ধ বলে, না। আল্লাহ্র কসম! আমার দৃষ্টিতে তোমাদের জন্য এই সিদ্ধান্ত সঠিক নয়। আল্লাহ্র কসম! তোমরা যদি তাকে কারারুদ্ধ কর তাহলে তাঁর খবর বন্ধ দরজা থেকে বেরিয়ে তাঁর সঙ্গীদের কাছে অবশ্যই পৌঁছে যাবে আর এটি অসম্ভব নয় যে, তারা তোমাদের ওপর আক্রমণ করে তোমাদের কাছ থেকে তাঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে এবং তাঁর সাহায্যে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে তোমাদের পরাজিত করবে; তাই অন্য কোন প্রস্তাব দাও। তখন একজন এই পরামর্শ দেয় যে, আমরা এই ব্যক্তিকে আমাদের মধ্যে থেকে বের করে দেই এবং আমাদের এই শহর থেকে দেশান্তরিত করি দেই, এরপর সে কোথায় গেল, কোথায় থাকল তা নিয়ে আমাদের কোন মাথাব্যথা থাকবে না। সে যখন আমাদের মধ্য থেকে বিদায় হবে এবং তাঁর কারণে সৃষ্ট মাথাব্যথা থেকে (আমরা) অব্যহতি পাব তখন আমাদের বিষয়ে শৃংখলা ফিরে আসবে। আমরা পুনরায় আগের মত জীবনযাপন করতে পারব। তখন সেই প্রৌঢ় নাজদী বলে যে, না! আল্লাহ্র কসম! এই মতামতও ঠিক না। তোমরা কি দেখ না এই ব্যক্তির কথা কতটা উৎকৃষ্ট মানের এবং তঁ ার কথা কতটা সমধুর, আর সে যাই বলে তার মাধ্যমে সে লোকদের হৃদয় কীভাবে জয় করে নেয়? আল্লাহ্র কসম! যদি তোমরা এরূপ করো তাহলে তোমরা নিরাপদে থাকতে পারবে না। কেননা, সে আরবের যে গোত্রেই যাবে সেখানে নিজ কথার মাধ্যমে তাদের মন জয় করে নিবে আর সেসব লোক তাঁর আনুগত্য করতে শুরু করবে। এরপর তঁ ার সাথে একত্রিত হয়ে তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করবে এবং তোমাদেরকে তোমাদেরই শহরে পদপিষ্ট করবে। তোমাদের বিষয়াদি তোমাদের হাত থেকে কেড়ে নিবে, এরপর যেমন ইচ্ছা তোমাদের সাথে ব্যবহার করবে। অতএব, এটি বাদ দিয়ে অন্য কোন প্রস্তাব নিয়ে ভাব। তখন আবু জাহল বলে, আমার মত হল, কুরাইশ বংশের সকল গোত্র থেকে একজন করে তরুণ বয়সের, শক্তপোক্ত এবং সম্ভ্রান্তবংশীয় যুবক নির্বাচিত করা হোক। এরপর তাদের সবার হাতে ধারালো তরবারি তুলে দেয়া হোক, এরপর তারা মুহাম্মদ (সা.)-এর সন্ধানে বের হোক এবং যথোচিত আক্রমণ করে তঁ াকে হত্যা করুক। এভাবে সেই ব্যক্তি থেকে আমাদের মুক্তি মিলবে। এভাবে হত্যা করার ফলে তঁ ার হত্যায় সকল গোত্রের ভূমিকা থাকবে আর বনূ আব্দে মনাফ সকল গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধও করতে পারবে না। যারফলে তারা রক্তপণ গ্রহণে সম্মত হয়ে যাবে আর আমরা রক্তপণ পরিশোধ করে দিব। এর প্রেক্ষিতে বৃদ্ধ নাজদী বলে, এটাই পরিকল্পনার মত পরিকল্পনা বাকি সব অযথা কথাবার্তা। অতএব, এই পরিকল্পনায় সবাই একমত হয়ে চলে যায়।

(আসসীরাতুন নাবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৩৪০-৩৪২)

অন্যদিকে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে এসব বিষয়ে অবগত করে দেন। যেভাবে আল্লাহ্ বলেন,

وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ أَوْ يَقْتُلُوْكَ أَوْ يُخْرِجُوْكَ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمٰكِرِيْنَ

আর স্মরণ কর! যখন কাফিররা তোমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল, যেন তারা তোমাকে অবরুদ্ধ করতে পারে অথবা তোমাকে হত্যা করতে পারে অথবা তোমাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে পারে। এবং তারা কৌশল আঁ াটছিল আর আল্লাহ্ও পরিকল্পনা করছিলেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ কৌশলকারীগণের মধ্যে উত্তম (সূরা আল্ আনফাল: ৩১)। একই সাথে জিব্রাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে মহানবী (সা.)-কে হিজরতের অনুমতি দিয়ে দেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, মক্কার কাফিররা মহানবী (সা)-কে হত্যা করার সংকল্প করে। তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ তাঁর পবিত্র নবী (সা.) -কে এই ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগত করেন এবং মক্কা থেকে মদীনায় হিজরতের আদেশ দেন। এরপর বিজয়ী বেশে ও ঐশী সমর্থনপুষ্ট হয়ে ফেরত আসার সুসংবাদ দেন। ভরা গ্রীষ্মের এক তপ্ত দুপুরে রোজ বুধবার আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়। "

(সুরমা চশম আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৪, টীকা)

হিজরতের অনুমতি পাবার পর মহানবী (সা.) অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হযরত আবু বকর (রা.)'র বাড়িতে ঠিক দুপরেঅর্থাৎ ঠিক সে সময়ে যান যখন মক্কাবাসী সাধারণত নিজ ঘরেই থাকে এবং কেউ কারও বাড়িতে যাওয়া আসা করে না। অতিরিক্ত সতর্কতাস্বরূপ এবং প্রচণ্ড গরমের কারণেও {তিনি (সা.)} নিজের চেহারা ও মাথা ইত্যাদি কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখেন। যখন তিনি (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)'র বাড়ির কাছে পেঁ ছান তখন কেউ একজন বলল, মহানবী (সা.) এসেছেন বলে মনে হচ্ছে; তিবরানী ও ফাতহুল বারীর বর্ণনা মোতাবেক হযরত আসমা (রা.)

একথা বললেন। আবু বকর (রা.) বলেন, আমার পিতামাতা তাঁর জন্য নিবেদিত। আল্লাহ্‌র কসম! মহানবী (সা.) এই সময়ে নিশ্চিত কোন বিশেষ কারণে এসেছেন। একইসাথে হযরত আবু বকর (রা.) ব্যতিব্যস্ত হয়ে নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তির ন্যায় বাহিরে বের হন। আর মহানবী (সা.) যখন ভেতরে প্রবেশ করেন তখন কামরায় হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত আসমা (রা.) ছিলেন। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর(রা.)-কে বলেন, 'তোমার সাথে যারা আছে তাদের বাইরে পাঠিয়ে দাও।' হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, 'হুযূর! কেবল আমার এই দুই মেয়ে-ই এখন এখানে আছে, আর কেউ নেই।' অপর এক বর্ণনা মতে তিনি (রা.) নিবেদন করেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! এখানে কেবল আপনার পরিবারের লোকজনই রয়েছে, অন্য কেউ নেই।' অতঃপর মহানবী (সা.) বলেন, 'আবু বকর! আমি হিজরতের অনুমতি পেয়ে গেছি।'

হযরত আবু বকর (রা.) তৎক্ষণাৎ অবলীলায় নিবেদন করেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার সঙ্গ পাবো কি?!' অর্থাৎ 'আমিও কি আপনার সাথে যেতে পারব?!' মহানবী (সা.) বলেন, 'হ্যাঁ।' এটি বুখারী শরীফের হাদীস।

(সহী বুখারী, কিতাবুল বুইয়ু, হাদীস-২১৩৮) (সহী বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, হাদীস-৩৯০৫) (ফতহুল বারী বি শারাহ সহী আল বুখারী, ৭ম খণ্ড, পৃ: ২৭৭)

একথা শুনে হযরত আবু বকর (রা.) আনন্দে কেঁদে ফেলেন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, 'আমি সেদিন-ই সর্বপ্রথম জানলাম- আনন্দেও কেউ কাঁদতে পারে!' (আসসীরাতুন নাবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ২৩৬)

এরপর সেখানে হিজরতের যাবতীয় পরিকল্পনা ও কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়। হযরত আবু বকর (রা.) নিবেদন করেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমি এই উদ্দেশ্যেই দু 'টি উটনী কিনে রেখেছিলাম, তাথেকে আপনি একটি নিয়ে নিন।' তিনি (সা.) বলে ন, 'মূল্য পরিশোধ করে নেব।' যখন তিনি (সা.) মূল্য পরিশোধের বিষয়ে অনড় থাকেন তখন হযরত আবু বকর (রা.) মূল্য গ্রহণ না করে পারলেন না। হযরত আবু বকর (রা.) দু 'টি উটনী আটশ' দিরহাম দিয়ে কিনেছিলেন, তা থেকে চারশ' দিরহাম মূল্যে একটি উটনী মহানবী (সা.) কিনে নেন। অপর এক রেওয়ায়েত অনুসারে মহানবী (সা.) আটশ' দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করে ছিলেন।

(সহী বুখারী, কিতাবু মানাকিবুল আনসার, হাদীস-৩৯০৫)(আত্তাবাকাতুল কুবরা লিইবনে সাআদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮২) (শারাহ যারকানি আলাল মোয়হিবুল লাদানী, ২য় খণ্ড, পৃ: ১০৫-১০৬)

এরপর ঠিক করা হয়, প্রথম বিরতি হবে সওর গুহায় এবং তিনদিন সেখানেই অবস্থান করা হবে। সেই সাথে এ-ও ঠিক করা হয়, এমন কোন দক্ষ ব্যক্তিকে সাথে নিতে হবে, যে মক্কার চতুর্দিকের সব চেনা-অচেনা মরুপথের বিষয়ে অবগত। এ কাজের জন্য আব্দুল্লাহ্ বিন উরায়কিতের সাথে কথা হয়; সে যদিও মুশরিক ছিল, কিন্তু ভদ্র, দায়িত্বশীল ও আস্থাভাজন ব্যক্তি ছিল। জীবনীকারকগণ তার সম্পর্কে বলেন, সে মুসলমান ছিল না, তবে এক বর্ণনামতে পরবর্তীতে সে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। যাহোক, তার হাতে তিনটি উটনী তুলে দেওয়া হয় এবং ঠিক করা হয়, সে ঠিক তিনদিন পর প্রত্যুষে সওর গুহায় চলে আসবে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আবু বকর যিনি একজন বুদ্ধিদীপ্ত যুবক ছিলেন, তার ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়- তিনি প্রতিদিন মক্কার বিভিন্ন আড্ডা-আলোচনায় ঘুরে ঘুরে খোঁজ-খবর নেবেন যে, কী শলা-পরামর্শ হচ্ছে; তারপর রাতের বেলা তিনি সওর গুহায় গিয়ে সবকিছু অবহিত করবেন। হযরত আবু বকর (রা.) 'র একজন বুদ্ধিমান ও দায়িত্বশীল দাস আমের বিন ফুহায়রা 'র ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়- তিনি নিজের ছাগপাল সওর গুহার আশেপাশেই চরাবেন এবং রাতের বেলা দুধেল ছাগলের টাটকা দুধ (তাঁদের কাছে) পৌঁছে দেবেন। মক্কা থেকে যাত্রার দিনক্ষণ ঠিক করার পর মহানবী (সা.) দ্রুত হযরত আবু বকর (রা.) 'র গৃহ থেকে নিজের গৃহে ফিরে আসেন।

(তারিখুল খামিস, ২য় খণ্ড, পৃ: ৭) (আররাহীকুল মাখতুম, প্রণেতা সফিউর রহমান আল মুবারকপুরী, পৃ: ১৬৫) (শারাহ যারকানি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২৯)

বাড়ি এসে তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে নিজের হিজরতের পরিকল্পনার বিষয়ে অবগত করে তাঁকে এক মহান বীরত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন; তা হল- সে রাতে তিনি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র বিছানায় সেই সবুজ বা আরেক বর্ণনামতে লাল রংয়ের হাযরামী (হাযারামওতে প্রস্তুতকৃত) চাদর গায়ে দিয়ে ঘুমাবেন, যা মহানবী (সা.) স্বয়ং গায়ে দিয়ে ঘুমাতেন। মহানবী (সা.) নিজের সেই মহান নিবেদিতপ্রাণ সেবককে ঐশী সাহায্য-সহযোগিতার বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করতে গিয়ে বলেন, 'চিন্তা করবে না, আর নিশ্চিন্তে আমার বিছানায় ঘুমিয়ে থাকবে; শত্রু তোমার কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না।'

একই সাথে আল্লাহ্ তা'লার সাদেক ও আমীন (সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত) রসূলের যেহেতু তাঁর কাছে গচ্ছিত মক্কাবাসীদের জিনিসপত্রের বিষয়েও চিন্তা ও দায়িত্ববোধ ছিল, তাই তিনি (সা.) {হযরত আলী (রা)-কে} বলেন, মানুষের আমানত প্রত্যার্পণ করে (মদীনায়) চলে এসো।' বস্তুতঃ হযরত আলী মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে মানুষজনকে গচ্ছিত জিনিসপত্র ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তিনদিন মক্কায় অবস্থান করেন। যখন তিনি (রা.) এই কাজ সম্পন্ন করেন তখন তিনিও কুবায় গিয়ে মহানবী (সা.)-এর সাথে মিলিত হন। "এরপর মহানবী (সা.) নিজের বাড়ি থেকে বাইরে বের হন যখন মক্কার কাফিরদের বাছাইকৃত বীরেরা, রাগে যাদের চোখ রক্তিমবর্ণ ছিল, তারা তরবারি হাতে নিয়ে ঠিক মহানবী (সা.)-এর বাড়িরবাইরে পূর্ণ সতর্কতার সাথে পাহারা দিচ্ছিল যে, 'কখন রাত গভীর হবে আর আমরা একযোগে আক্রমণ করে এক আঘাতেই রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভবলীলা সাঙ্গ করে দেব।' আর আবু জাহল যে তাদের নেতা ছিল, সে অত্যন্ত অহংকার ও বিদ্রূপাত্মক স্বরে বলছিল, 'মুহাম্মদ তো বলে, যদি তোমরা তাঁর কাজে তঁার অনুগামী হও তবে তোমরা আরব ও অনারবদের বাদশাহ্‌হয়ে যাবে। এরপর তোমাদের মৃত্যুর পর তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে, তখন আদনের বাগানের মত (স্থায়ী) বাগান তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হবে। কিন্তু যদি তোমরা এমনটি না কর তবে তোমাদের মাঝে খুনোখুনি-রাহাজানি ছড়িয়ে পড়বে।' মহানবী (সা.) বাইরে আসেন এবং বলেন, 'হ্যাঁ, আমি এমনটিই বলে থাকি।' এবং সূরা ইয়াসীনের নিম্নোক্ত আয়াতগুলো পাঠ করেন:

يٰسٓ۔ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ۔
اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ۔ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ۔ تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ۔ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ۔ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰٓى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ۔ اِنَّا جَعَلْنَا فِيْٓ اَعْنَاقِهِمْ اَغْلٰلًا فَهِيَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ۔ وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ۔ (يٰسٓ:2-10)

অর্থাৎ: 'ইয়া সীন- (হে নেতা)! প্রজ্ঞাপূর্ণ কুরআনের শপথ! নিশ্চয়ই তুমি রসূলগণের অর্ন্তভুক্ত, সরল-সুদৃঢ় পথে প্রতিষ্ঠিত। এটি মহা পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়ের পক্ষ থেকে অবতীর্ণ; যেন তুমি সেই জাতিকে সর্তক কর যাদের পিতৃপুরুষগণকে সর্তক করা হয়নি, যার ফলে তারা উদাসীন। নিশ্চয়ই তাদের অধিকাংশের বিষয়ে (ঐশী) বাক্য পূর্ণ হয়ে গিয়েছে, অতএব তারা ঈমান আনবে না। নিশ্চয় আমরা তাদের গলায় বেড়ি পরিয়ে দিয়েছি যা তাদের চিবুক পর্যন্ত বিস্তৃত, এজন্য তারা মাথা উঁচু করে রেখেছে। আর আমরা তাদের সামনেও এক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে দিয়েছি এবং তাদের পেছনেও এক প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করে দিয়েছি এবং তাদের পর্দা দিয়ে ঢেকে দিয়েছি, ফলে তারা দেখতে পায় না।'

(সূরা ইয়াসীন: ২-১০)

এই আয়াতগুলো পাঠ করতে করতে তিনি (সা.) তাদের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের সামনে দিয়ে বের হয়ে যান। অথচ খোদার মহিমা, তাঁর (সা.) বের হয়ে যাওয়াটা কারও দৃষ্টিগোচর হয়নি। বরং তারা একটু পরপর ভেতরে উঁকি দিয়ে দেখতো আর নিশ্চিন্ত থাকতো যে, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বিছানাতেই শুয়ে আছেন।

(আসসীরাতুন নাবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ:৩৪২,৩৪৮) (মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ ওয়াল্লাযীনা মাআহু, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৭৪, (আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৭৬)

এ ঘটনাটি সীরাত খাতামান্ নবীঈন পুস্তকে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) এভাবে উল্লেখ করেছেন:

"অন্ধকার রাত ছিল এবং অত্যাচারী কুরাইশরা, যারা বিভিন্ন গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখত, তারা হত্যার অভিসন্ধি নিয়ে তাঁর (সা.) বাড়ির চতুর্দিকে সমবেত হয়ে তাঁর বাড়ি অবরোধ করে রেখেছিল। তারা অপেক্ষা করছিল, সকাল হলে কিংবা তিনি (সা.) নিজের ঘর থেকে বের হলে তাঁর ওপর আকস্মিক আক্রমন করে তাঁকে তাকে হত্যা করা হবে। মহানবী (সা.)-এর কাছে কতক কাফিরের আমানত গচ্ছিত ছিল। কারণ প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ তাঁর (সা.) সততা ও বিশ্বস্ততার কারণে নিজেদের ধন-সম্পদ তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখত। এজন্য তিনি (সা.) হযরত আলী (রা.)-কে সেসব গচ্ছিত জিনিসের হিসাব-নিকাশ বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। আর জোর নির্দেশ দিয়েছিলেন, গচ্ছিত জিনিসপত্র ফিরিয়ে না দিয়ে তিনি যেন মক্কা ত্যাগ না করেন। এরপর তিনি (সা.) তাঁকে বলেন, 'তুমি আমার বিছানায় শুয়ে পড়;' আর তাঁকে আশ্বস্ত করেন যে , খোদার কৃপায় তাঁর কোন ক্ষতি হবে না। তিনি বিছানায় শুয়ে পড়েন এবং মহানবী (সা.) নিজের লাল রঙের চাদর তাঁর গায়ে জড়িয়ে দেন। এরপর তিনি (সা.) আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে বাড়ি থেকে বের হন। সে সময় অবরোধকারীরা তার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। কিন্তু যেহেতু তারা ধারণা করতে পারেনি যে, মহানবী (সা.) এভাবে রাতের প্রথম প্রহরেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবেন, তাই তারা সে সময় এতটাই উদাসীন ছিল যে, তিনি (সা.) তাদের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের সামনে দিয়েই বের হয়ে আসেন, অথচ তারা টেরই পেল না। সেসব কুরাইশ, যারা তাঁর (সা.) বাড়ি অবরোধ করে রেখেছিল, তারা কিছুক্ষণ পর পর তাঁর ঘরের ভেতর উঁকি দিয়ে দেখতো আর হযরত আলী (রা.)-কে তাঁর (সা.) স্থলে শায়িত দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে যেতো। কিন্তু প্রভাত হলে তারা জানতে পারে যে, তাদের শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে। এতে তারা এদিক সেদিক ছোটাছুটি করে আর মক্কার অলিগলিতে সাহাবীদের বাড়িঘরে অনুসন্ধান করে, কিন্তু কোন খোঁজ পায় নি। এই ক্রোধে তারা হযরত আলী (রা.)-কে ধরে আর কিছুটা প্রহারও করে।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ, পৃ: ২৩৬-২৩৭)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, মহানবী (সা.) যখন অকস্মাৎ নিজের মাতৃভূমি ছেড়ে যাচ্ছিলেন, আর বিরোধীরা হত্যার মানসে চতুর্দিক থেকে এই বরকতমণ্ডিত বাড়িটি ঘেরাও করে, তখন এক অত্যন্ত প্রিয়ভাজন, যার প্রকৃতি ছিল ভালোবাসা ও বিশ্বাসে সমৃদ্ধ, জীবনবাজি রেখে মহানবী (সা.)-এর বিছানায় তাঁরই নির্দেশে এই উদ্দেশ্যে মুখ ঢেকে শুয়ে থাকেন যেন বিরোধীদের গুপ্তচরেরা মহানবী (সা.)-এর বেরিয়ে যাওয়ার বিষয়ে কোন খোঁজখবর না নেয় আর তাকেই মহানবী (সা.) ভেবে হত্যার উদ্দেশ্যে অপেক্ষায় থাকে।

کس بہرِ کسے سرندہد جاں نفشاند — عشق است کہ ایں کار بصد صدق کناند

(উচ্চারণ: কাস বাহরে কাসি সার নাদাহাদ জাঁ নাফেশানাদ
ইশক আস্ত কেহ্ ঈন কার বাসাদ সিদক কুনান্দ)

(সুরমা চশম আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৪-৬৫)

অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি কারও জন্য প্রাণবিসর্জন দেয় না, আর না জীবনবাজি রাখে। এটি ভালোবাসাই, যা গভীর নিষ্ঠার সাথে মানুষের হাতে এই কাজ করিয়ে থাকে।

{মহানবী (সা.)-এর বাড়ি থেকে} বের হওয়ার সময় সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে, কেউ কেউ বলে থাকে প্রথম প্রহরে, কেউ বলে মধ্যরাতে, কেউ কেউ বলে শেষরাতে। যাহোক, মহানবী (সা.) কখন নিজ ঘর থেকে বের হন এ সম্পর্কে বিভিন্ন রেওয়ায়েতে যে মতপার্থক্য রয়েছে তার উল্লেখ করছি।

একটি রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি (সা.) রাতের শেষ তৃতীয়াংশে বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়েছিলেন। যেমনমুহাম্মদ হোসেন হ্যায়কল লিখেন যে, রাতের শেষ তৃতীয়াংশে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এই মুশরিকদের উদাসীনতার ঘোরে হযরত আবু বকর (রা.)-এর বাড়ির উদ্দেশ্যে বের হন আর সেখান থেকে উভয়ে বাড়ির পিছন দিকের দরজা দিয়ে বের হয়ে দক্ষিণ দিকে সওর গুহা অভিমুখে যাত্রা করেন।

(হায়াতে মহম্মদ, প্রণেতা মহম্মদ হোসেন হ্যায়কাল, পৃ: ২২৩-২২৪)

আরেক রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, তিনি (সা.) মধ্যরাতে বের হন।

যেমন 'দালায়েলুন্ নবুওয়্যা'-তে লেখা আছে, মহানবী (সা.) এবং হযরত আবু বকর (রা.) মধ্যরাতে সওর গুহা অভিমুখে যাত্রা করেছিলেন।

(দালাইলিন নবুয়্যত লিল বাইহাকি, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৬৫-৪৬৬)

'মাদারেজুন নবুওয়্যা'-তে লেখা আছে, মহানবী (সা.) প্রভাতে হিজরত করার মনস্থ করেন, আর সন্ধ্যায়ই হযরত আলী মুর্তজা (কারামাল্লাহু ওয়াজহাহু'কে) বলেন, আজ রাতে তুমি এখানেই শোবে যেন মুশরিকরা সন্দেহ-সংশয়ের ঘোরে প্রকৃত অবস্থা অবগত না হয়।

(মাদারিজুন নবুয়্যত, প্রণেতা-শেখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী, উর্দু অনুবাদ: গোলাম মাঈনুদ্দীন নাঈমী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮৩)

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) যা লিখেছেন তা হল, মহানবী (সা.) রাতের প্রথম প্রহরে নিজের বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। এর বিস্তারিত বিবরণে তিনি (রা.) লিখেন যে,

অবরোধকারীরা তাঁর (সা.) বাড়ির সামনেই উপস্থিত ছিল, কিন্তু যেহেতু তাদের এই ধারণা ছিল না যে, মহানবী (সা.) এভাবে রাতের প্রথম প্রহরেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসবেন, তাই তখন তারা এতটাই উদাসীন ছিল যে, তিনি (সা.)তাদের চোখে ধুলো দিয়ে তাদের মধ্য থেকে বেরিয়ে যান, অথচ তারা টেরও পায় নি। এরপর মহানবী (সা.) নীরবে কিন্তু দ্রুত পদক্ষেপে মক্কার অলিগলি পেরিয়ে স্বল্পক্ষণের মাঝেই লোকালয় থেকে বেরিয়ে সওর গুহার পথ ধরেন। হযরত আবু বকর (রা.)-এর সাথে সমস্ত কথাবার্তা পূর্বেই হয়ে গিয়েছিল। তিনিও পথিমধ্যে এসে মিলিত হন।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, প্রণেতা মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ, পৃ: ২৩৭)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বিভিন্ন রেওয়ায়েতের আলোকে যা বর্ণনা করেছেন তা হল, "মক্কাবাসীরা যখন তাঁকে(সা.) হত্যার মানসে তাঁর (সা.) বাড়ির সামনে সমবেত হচ্ছিল তখন তিনি (সা.) রাতের অন্ধকারে হিজরতের উদ্দেশ্যে নিজের বাড়ি হতে বাইরে বের হচ্ছিলেন। মক্কাবাসীরা নিশ্চয় সন্দেহ করে থাকবে যে, তাদের ষড়যন্ত্রের সংবাদ মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)ও হয়ত পেয়ে গেছেন, কিন্তু তারপরও যখন তিনি (সা.) তাদের সামনে দিয়ে যান তখন তারা এটিই ভাবে যে, ইনি অন্য কোন ব্যক্তি হবেন আর তাঁর (সা.) ওপর আক্রমণ করার পরিবর্তে একদিকে পাশ কাটিয়ে তাঁর কাছ থেকে লুকানোর চেষ্টা করে যাতে তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মুহাম্মদ (সা.) জানতে না পারেন। এই রাতের আগের দিনেই তাঁর (সা.)সাথে হিজরত করার জন্য হযরত আবু বকর (রা.)-কে সংবাদ দেওয়া হয়েছিল। অতএব, তিনিও এসে তাঁর (সা.) সাথে মিলিত হন এবং উভয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই একসাথে মক্কা হতে যাত্রা করেন।"

(দিবাচা তফসীরুল কুরআন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২০, পৃ: ২২২-২২৩)

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ভাষ্যমতে মহানবী (সা.) সকাল বেলা ঘর থেকে বের হয়েছিলেন। যেমন তিনি (আ.) বলেন, " যাওয়ার সময় মহানবী (সা.)-কে কোন বিরোধী দেখতে পায় নি, অথচ সকাল বেলা ছিল এবং সকল বিরোধী মহানবী (সা.)-এর বাড়ি অবরোধ করে রেখেছিল। কাজেই খোদা তা'লা, যেমনটি সূরা ইয়াসীনে এর উল্লেখ করেছেন, সেসব হতভাগার চোখ পর্দাবৃত করে দেন এবং মহানবী (সা.) তাদের চোখে ধুলো দিয়ে বেরিয়ে যান।"

(সুরমা চশম আরিয়া, রূহানী খাযায়েন, ২য় খণ্ড, পৃ: ৬৬)

যাহোক, বিভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে, কিন্তু সারকথা হল, কাফিররা বুঝতে পারে নি। এ ছাড়া নিজের বাড়ি থেকে বের হয়ে মহানবী (সা.) কোন দিকে গিয়েছেন সে সম্পর্কেও ভিন্ন রেওয়ায়েত রয়েছে।

একটি বিবরণ থেকে এই ধারণা পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) নিজের বাড়ি থেকে বের হয়ে থাকবেন এবং হযরত আবু বকর (রা.) নিজের ঘর হতে আর পথিমধ্যে কোন এক জায়গায় উভয়ে মিলিত হয়ে সওর গুহা অভিমুখে যাত্রা করেন।

(তারিখে তাবারী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৬৮)

একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী (সা.) নিজের ঘর হতে সওর গুহার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং কিছুক্ষণ পর হযরত আবু বকর (রা.) তাঁর (সা.) বাড়ি পোঁছেন, তখন হযরত আলী (রা.) তাঁকে বলেন যে, তিনি (সা.) তো রওয়ানা হয়ে গিয়েছেন এবং সওর গুহার দিকে যাচ্ছেন, তাই আপনিও তাঁর (সা.)-এর পিছন পিছন রওয়ানা হয়ে যান। অতএব, হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-এর পিছনে রওয়ানা হয়ে যান। (আসসীরাতুল হালবিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৭)

যাহোক, এই বর্ণনা অনেক দুর্বল বলে মনে হয়, কেননা এটি থেকে এই ধারণা জন্মে যে, মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর জন্য অপেক্ষা করতে থাকেন এবং তিনি (রা.) বিলম্বে আসেন। সেইসাথে হযরত আবু বকর (রা.) এটিও জানতেন না যে, মহানবী (সা.) কোন দিকে গিয়েছেন আর হযরত আলী (রা.) এখন তাঁকে সবকিছু অবগত করছেন। হিজরতের ন্যায় অতি গুরুত্বপূর্ণ ও গোপনীয় সফর এবং হযরত আবু বকর (রা.)'র ন্যায় বিজ্ঞ ও দায়িত্বশীল ব্যক্তি এরূপ উদাসীনতা প্রদর্শন করবেন- এটি কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই এই রেওয়ায়েতের বিপরীতে অপর রেওয়ায়েত যা অধিকাংশ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে, তা-ই অধিক সঠিক ও অনুমেয় বলে মনে হয়, কেননা সেটি অনুযায়ী মহানবী (সা.) নিজের বাড়ি থেকে বের হয়ে সোজা হযরত আবু বকর (রা.)'র বাড়ি যান এবং সেখান থেকে হযরত আবু বকর (রা.)-কে সঙ্গে করে সওর গুহার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

(আসসীরাতুন নাবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৩৪৩)

সে সময় হযরত আবু বকর (রা.)'র দু'জন বিশ্বস্ত ও সাহসী কন্যা হযরত আয়েশা (রা.) ও হযরত আসমা (রা.) সফরের জন্য দ্রুত খাবারও প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন, যাতে ছাগলের ভুনা মাংসও ছিল। পরিস্থিতির স্পর্শকাতরতা ও তাড়াহুড়োর কারণে চামড়ার তৈরী খাবারের পাত্র বাঁধার জন্য, কোন কিছু না পেয়ে হযরত আসমা (রা.) তাঁর নিতাক অর্থাৎ কোমরবন্ধনী খুলে তা দু'টুকরো করেন এবং খাবার বেঁধে দেন। তিনি একটি টুকরা দিয়ে খাবারের থলি এবং অন্য টুকরো দিয়ে মশক বা পানির পাত্রের মুখ বেঁধে দেন।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ ওয়াস সেইর, হাদীস-২৯৭৯)

মহানবী (সা.) ভালোবাসা ও বিশ্বস্ততার এ মুহূর্তগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে দেখছিলেন বলে উঠেন, হে আসমা! আল্লাহ্ তা'লা তোমার এই নিতাক বা কোমরবন্ধনীর বিনিময়ে জান্নাতে তোমাকে দু'টি নিতাক দান করবেন। অর্থাৎ সেই কোমরবন্ধ যা তার কোমরে বাধা ছিল। মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে এই উক্তির কারণে পরবর্তীতে হযরত আসমা (রা.)-কে 'যাতুন নিতাকায়ন' (তথা দুই কোমরবন্ধী বিশিষ্ট) বলা হত।

(সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩৯)

হিজরতের এই সফরে মহানবী (সা.)-এর মুখে সদা যে আয়াত উচ্চারিত হচ্ছিল তা হল: وَقُلْ رَّبِّ اَدْخِلْنِیْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِیْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّ اجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِیْرًا অর্থাৎ, তুমি বল, হে আমার প্রভু! আমাকে এমনভাবে প্রবেশ করাও যেন আমার প্রবেশ সত্যসহকারে হয় আর আমাকে এমনভাবে বের কর যেন আমার বের হওয়া সত্যসহকারে হয় আর তুমি নিজ সন্নিধান থেকে আমার জন্য শক্তিশালী সাহায্যকারী দান কর। (সূরা বনী ইসরাঈল: ৮১)

একইভাবে এ দোয়ারও উল্লেখ পাওয়া যায় যে,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَنِیْ وَلَمْ أَكُ شَيْئًا. اَللّٰهُمَّ أَعِنِّیْ عَلٰی هَوْلِ الدُّنْيَا، وَبَوَائِقِ الدَّهْرِ، وَمَصَائِبِ اللَّيَالِیْ وَالْأَيَّامِ. اَللّٰهُمَّ اصْحَبْنِیْ فِیْ سَفَرِیْ، وَاخْلُفْنِیْ فِیْ أَهْلِیْ، وَبَارِكْ لِیْ فِيْمَا رَزَقْتَنِیْ، وَلَكَ فَذَلِّلْنِیْ، وَعَلٰی صَالِحِ خُلُقِیْ فَقَوِّمْنِیْ، وَإِلٰی رَبِّیْ فَحَبِّبْنِیْ، وَإِلَی النَّاسِ فَلَا تَكِلْنِیْ. أَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَأَنْتَ رَبِّیْ، أَعُوْذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ الَّذِیْ أَشْرَقَتْ لَهُ السَّمٰوَاتُ وَالْأَرْضُ، وَكُشِفَتْ بِهِ الظُّلُمَاتُ، وَصَلُحَ عَلَيْهِ أَمْرُ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ، أَنْ يَّحِلَّ بِیْ غَضَبُكَ، أَوْ يَنْزِلَ عَلَیَّ سُخْطُكَ، أَعُوْذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَجَمِيْعِ سُخْطِكَ. لَكَ الْعُتْبٰی خَيْرَ مَا اسْتَطَعْتُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ.

অর্থাৎ, সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহ্‌র যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন অথচ (এক সময়) আমি কিছুই ছিলাম না। হে আল্লাহ্! জগতের ভয়, যুগের বিপদাবলী এবং রাত ও দিনের বিপদাবলীতে আমাকে সাহায্য কর। হে আল্লাহ্! আমার সফরে তুমি আমার সাথী হও এবং আমার পরিবারে আমার স্থলাভিষিক্ত হও আর তুমি

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol-7 Thursday, 27Jan, 2022 Issue No. 4

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs. 575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

আমাকে যা দিয়েছ তাতে আমার জন্যপ্রভূত কল্যাণ দান কর আর আমাকে তোমার অনুগামী করে দাও এবং আমার উত্তম গঠনকে শক্তিধর বানাও আর আমার প্রভুকে আমার প্রিয় বানিয়ে দাও এবং আমাকে মানুষের হাতে ছেড়ে দিও না। তুমি দুর্বলেরও প্রভু আর আমারও প্রভু। তোমার পবিত্র চেহারা, যদ্বারা আকাশ ও পৃথিবী আলোকিত হয়েছে এবং যদ্বারা অন্ধকার বিদূরিত হয়েছে আর যদ্বারা পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের বিষয় সঠিক খাতে পরিচালিত হয়েছে, তোমার ক্রোধ এবং তোমার অসন্তুষ্টি আমার প্রতি অবতীর্ণ হওয়া থেকে আমি এর (অর্থাৎ তোমার পবিত্র চেহারার) আশ্রয়ে এলাম। তোমার নিয়ামত প্রত্যাহৃত হওয়া থেকে এবং হঠাৎ করে নেমে আসা শাস্তি থেকে আর আমার বিষয়ে তোমার শেষ সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আমি তোমার আশ্রয়ে এলাম।

যুরকানীর ব্যাখ্যায় 'تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ'-এর স্থলে تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ শব্দ লেখা হয়েছে। এর অর্থ হল, তোমার প্রদত্ত নিরাপত্তা উঠে যাওয়া থেকে (তোমার আশ্রয় চাচ্ছি)। আর তোমার সব ধরনের অসন্তুষ্টির মুখে তোমার সন্তুষ্টিই যেন সকল পুণ্যে আমার সহায়ক হয়। তোমার সাহায্য ছাড়া কোন পাপ থেকে রক্ষা পাবার কোন উপায় নেই এবং কোন পুণ্যকর্ম করারও শক্তি নেই।

(সুবালুল হুদা ওয়ার রাশাদ,৩য় খণ্ড,পৃ: ২৪৩) (শারাহ যারকানি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১১০, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেইরুত, ১৯৯৬)

কা'বা গৃহের পেছন দিয়ে যাওয়ার সময় মহানবী (সা.) নিজের পবিত্র চেহারা কা'বামুখী করে মক্কাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ, হে মক্কা! আল্লাহ্‌র পৃথিবীতে তুমি আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় আর পৃথিবীর সব জায়গার তুলনায় তুমি আল্লাহ্‌র কাছে সর্বাধিক প্রিয়। তোমার অধিবাসীরা যদি আমাকে বলপূর্বক বের করে না দিত, তবে আমি কখনও এখান থেকে বের হতাম না।

(মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ ওয়াল্লাযীনা মাআহু লি আব্দিল হামিদ, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৫৯)

ইমাম বায়হাকী লিখেন, সওর অভিমুখে সফরকালে হযরত আবু বকর (রা.) কখনও মহানবী (সা.)-এর অগ্রে কখনও পশ্চাতে আবার কখনও ডানে আর কখনও বামে হাঁটতেন। মহানবী (সা.) এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার যখন ধারণা হয় যে, কেউ সম্মুখ থেকে না এসে যায় তখন আমি আপনার সামনে চলে যাই আবার যখন আশংকা হয় যে, কেউ পেছন থেকে না আক্রমণ করে বসে, তখন আমি আপনার পেছনে চলে যাই আর একইভাবে কখনও ডানে আবার কখনও বামে যাই যেন আপনি চতুর্দিক থেকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ থাকেন।

(মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ ওয়াল্লাযীনা মাআহু লি আব্দিল হামিদ, ৩য় খণ্ড,পৃ: ২৪০)

এক রেওয়ায়েত অনুযায়ী সওর গুহা পর্যন্ত পৌঁছতে পৌঁছতে পাহাড়ি রাস্তায় সফরের কারণে মহানবী (সা.)-এর পবিত্র পা ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছিল।

(তারিখে তাবারী, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৬৮)

আবার আরেকটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী, পথিমধ্যে একটি পাথরে হোঁচট খাওয়ার কারণে তাঁর (সা.) পবিত্র পা ক্ষতবিক্ষত হয়েছিল। সওর গুহায় যখন পৌঁছান তখন হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-কে বিনীতভাবে বলেন, আপনি এখানে দাঁড়ান, প্রথমে আমাকে ভেতরে যেতে দিন যাতে আমি গুহার ভেতরটা ভালোভাবে পরিষ্কার করতে পারি এবং বিপজ্জনক কিছু থাকলে আমি যেন প্রথমে সেটির মোকাবিলা করতে পারি। অতএব, তিনি (রা.) প্রথমে ভেতরে যান এবং গুহাটি পরিষ্কার করেন। সেখানে যেসব ছিদ্র এবং কোঠর ইত্যাদি ছিল, তা নিজের কাপড় দিয়ে বন্ধ করেন। অতঃপর মহানবী (সা.)-কে ভেতরে আসার আহ্বান জানান। বলা হয়, মহানবী (সা.) হযরত আবু বকর (রা.)-এর উরুর ওপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন আর একটি ছিদ্র যা বন্ধ করার কাপড় ছিল না কিংবা সম্ভবত তখন চোখে পড়ে নি, সেটির ওপর হযরত আবু বকর (রা.) নিজের পা রেখে দেন।

রেওয়ায়েতে উল্লেখ আছে, সেই গর্ত থেকে কোন বিছে কিংবা সাঁপ বেরিয়ে দংশন করছিল কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) এই ভয়ে কোন নড়াচড়া করেন নি পাছে মহানবী (সা.)-এর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে।

মহানবী (সা.)-এর যখন ঘুম ভাঙ্গে তখন হযরত আবু বকর (রা.)'র বিবর্ণ চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করেন, কী ব্যাপার? তখন তিনি (রা.) সমস্ত ঘটনা খুলে বলেন। তখন মহানবী (সা.) তাঁর (মুখের) পবিত্র লালা সেখানে লাগিয়ে দেন, ফলে পা এমন হয়ে যায় যেন এর কিছুই হয় নি।

(শারাহ যারকানি, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২১, বাব হিজরাতুল মুস্তফা)

অন্যদিকে মক্কার কু রাইশরা যারা মহানবী (সা.)-এর গৃহ পরিবেষ্টন করে রেখেছিল, তাদেরকে দেখে এক ব্যক্তি পাশ দিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করে, এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? তারা কারণ বললে সেই ব্যক্তি বলল, আমি তো মুহাম্মদ (সা.)-কে গলি দিয়ে যেতে দেখেছি। একথা শুনে তারা সেই ব্যক্তির সাথে ঠাট্টাচ্ছলে বলে, সে তো বিছানায় শুয়ে আছে আর আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে তার ওপর চোখ রেখেছি। অতঃপর গভীর রাতে পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী যখন তারা হঠাৎ করে ভেতরে গিয়ে চাদর টান দেয় তখন তারা দেখে যে, তিনি তো হযরত আলী (রা.)। তাঁকে জিজ্ঞেস করল, মুহাম্মদ কোথায়? উত্তরে তিনি বলেন, আমার জানা নেই। একথা শুনে মুশরিকরা তাঁকে বকাঝকা ও মারধোর করে।তারপর কিছুক্ষণ আটকে রাখার পর তাঁকে ছেড়ে দেয়।

যাহোক, এই রেওয়ায়েত অনুযায়ী তারা সেখান থেকে ক্রোধ ও রাগের ঘোরে হযরত আলী (রা.)-কে গালাগালি ওমারধোর করে ফেরত চলে আসে আর ম

ক্কার অলিগলি ও প্রতিটি বাড়িতে তাঁকে (সা.) খুঁজতে থাকে।

[তারিখুল খামিস,২য় খণ্ড, পৃ: ১০, যিকর খুরুজুহু (সা.) মাআ আবু বাকার]

তখন তারা হযরত আবু বকর (রা.)'র বাড়িতেও যায়। হযরত আসমা (রা.)'র মুখোমুখী হয়। আবু জাহল সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমার পিতা আবু বকর (রা.) কোথায়? তিনি বলেন, আমি জানি না তিনি কোথায়। অতঃপর সেই নোংরা প্রকৃতির (মানুষ) আবু জাহল নিজের হাত উঠায় এবং হযরত আসমা (রা.)'র মুখে এত জোরে চড় মারে যে, তাঁর কানের দুল ছিঁড়ে পড়ে যায় আর রাগান্বিত হয়ে সবাই ফেরত চলে যায়।

(আসসীরাতুন নাবুয়্যত লি ইবনে হিশাম, পৃ: ৩৪৪)

গোটা মক্কা তন্নতন্ন করি খুঁজে বেড়িয়েও তারা সফল হয় নি তখন দক্ষ খোঁজীদের মক্কার চতুর্দিকে পাঠিয়ে দেয়। মক্কার এক নেতা উমাইয়্যা বিন খালফ নিজে একজন অভিজ্ঞ খোঁজী এবং নিজ সঙ্গীদের নিয়ে একদিকে যাত্রা করে। আর এই খোঁজী যে সত্যিই অনুসন্ধানে অভিজ্ঞ ছিল তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। তার দক্ষতার যতই প্রশংসা করা হোক না কেন তা যথেষ্ট হবে না কেননা, এই ব্যক্তি একমাত্র খোঁজী ছিল যে কিনা মহানবী (সা.)-এর পায়ের ছাপঅনুসরণ করে ঠিক সওর গুহার মুখ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল এবং বলেছিল, মুহাম্মদ (সা.)-এর পায়ের ছাপ এ পর্যন্তই এসে সমাপ্ত হয়েছে। এর সামনে আর যায় নি। আল্লামা বিলাজুরী এই খোঁজীর নাম বলেছেন আলকামা বিন কুরস। তিনি লিখেন, মক্কা বিজয়ের সময় তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সওর গুহার মুখে তারা দাঁড়িয়ে কথা বলছিল। আর দু'জন হিজরতকারী ঠিক সেই গুহায় কেবল লুকিয়েই ছিলেন না বরং তাদের কথোপকথনও শুনছিলেন। বরং হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, আমি তাদের পা-ও দেখতে পাচ্ছিলাম আর আল্লাহ্‌র শপথ করে বলছি, তাদের কেউ একজনও যদি ভেতরে উঁকি মেরে দেখত, তাহলে আমরা ধরা পড়ে যেতাম।

কিন্তু বিপদসঙ্কুল সেই সময় তাঁরা কেবল দু'জনই ছিলেন না বরং তাদের সাথে তৃতীয়জন ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লা- আকাশ ও পৃথিবী যাঁর হাতের মুঠোয় এবং যিনি সর্বশক্তিমান।

(সুবালুল হুদা ওয়ার রাশাদ, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৪১) (সহী বুখারী, কিতাবু ফাযাইলি আসহাবিন নাবী, বাব মানাকিবুল মুহাজিরীন ওয়া ফাযলুহিম, হাদীস-৩৬৫৩)

তিনি নিজ অলৌকিক ক্ষমতাবলে তাদের আসার পূর্বেই সেখানে একটি চারাগাছ উদগত করে দিয়েছিলেন, মাকড়শা পাঠিয়ে গুহার মুখে একটি জাল বুনিয়ে দেন, আর এক জোড়া কবুতর প্রেরণ করেন যেন তারা সেখানে বাসা বেধে ডিম পেড়ে রাখে, রেওয়ায়েতে এটিই উল্লেখিত আছে।

(আল মোয়াহিবুল লাদানিয়া লি আল্লামা কুসতুলানি,১ম খণ্ড, পৃ: ২৯২-২৯৩)

যাহোক, এরপর আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে কীভাবে সান্ত্বনা দেন, অথবা আল্লাহ্ তা'লার আদেশে এসব বিষয় দেখার পর কীভাবে আবু বকর (রা.)-কে তিনি সান্ত্বনা দেন- আগামীতে ইনশাআল্লাহ্ এ বিষয়ে উল্লেখ করা হবে।

****

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir